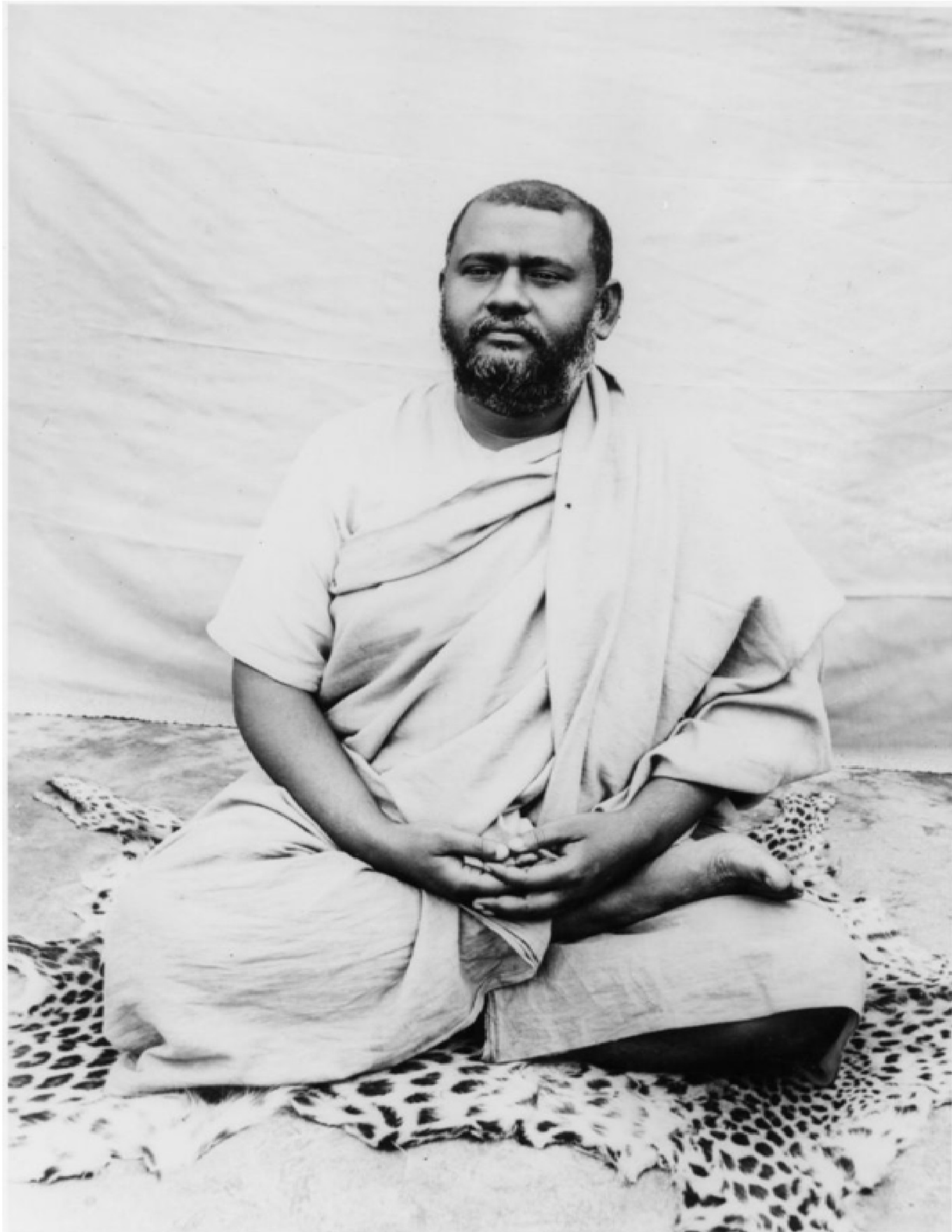




স্বামী ব্রহ্মানন্দ

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সুদীর্ঘ সাধনা-সমাপনান্তে ত্যাগী ভক্তদের সঙ্গলাভের বাসনায় একদিন শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন, “বিষয়ী সংসারী লোকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে জিভ জ্বলে গেল।” জগন্মাতা আশ্বাস দিলেন, “ভয় নাই, ত্যাগী শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তেরা আসছে।” ফলেও দেখা গেল যে, যথাকালে ত্যাগী যুবকগণ আসিতে লাগিলেন। এই অন্তরঙ্গদের মধ্যে আবার শ্রীযুক্ত রাখালের স্থান অতি উচ্চ। তিনি স্বল্পসংখ্যক ঈশ্বরকোটিদের অন্যতম এবং ঠাকুরের মানসপুত্র। জগন্মাতা তাঁহার আগমনের কথা পূর্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণকে জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, “রাখাল আসিবার কয়েকদিন পূর্বে দেখিতেছি, মা একটি বালককে সহসা আমার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, ‘এইটি তোমার পুত্র।’ শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম, ‘সে কি?—আমার আবার ছেলে?’ তিনি তাহাতে হাসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, ‘সাধারণ সংসারিভাবে ছেলে নয়, ত্যাগী মানসপুত্র।’ তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরে রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বুঝিলাম—এই সেই বালক।”

শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র ঘোষ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি মঙ্গলবার (১২৬৯ বঙ্গাব্দের ৮ মাঘ, চান্দ্রমাঘ শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে, রাত্রি প্রায় একটায়) বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিকরা-কুলীনগ্রামে এক অতি সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আনন্দমোহন ঘোষ সম্ভ্রান্তপন্ন জমিদার ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতা কৈলাসকামিনীর দেহত্যাগ হয়। অতঃপর পিতা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন এবং বিমাতা হেমাঙ্গিনীর স্নেহময় ক্রোড়ে রাখালচন্দ্র মানুষ হইতে থাকেন।

উপযুক্ত বয়সে বিদ্যাভ্যাসের জন্য বাটির নিকটে একটি বিদ্যালয় স্থাপনপূর্বক আনন্দমোহন উহাতে রাখালকে ভর্তি করিয়া দিলেন। সেখানে বালকের সৌম্য সুন্দর আকৃতি ও মাধুর্যময় কোমল প্রকৃতিতে ছাত্র ও শিক্ষক সকলেই আকৃষ্ট হইলেন। অধিকন্তু তিনি অল্পদিনেই সহপাঠীদের নেতৃত্বলাভ করিলেন। অধ্যয়নাদিতেও তাঁহার সবিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেল। রাখাল স্বভাবতই বন্ধুবৎসল ছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে শিক্ষকগণ প্রহার করিলে তিনি সমবেদনায় অভিভূত হইতেন। ইহার ফলে শিক্ষকদের অন্তরেও ক্রমে কোমলতার সঞ্চার হইল এবং তাঁহারা ঐ গর্হিত অভ্যাস ত্যাগ করিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়েও রাখালের বেশ উৎসাহ ছিল। ক্রীড়াদিতে যেমন কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না, কুস্তিতেও তেমনি কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিত না। গ্রামের বিবিধ

ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইতেন। পিতার দৃষ্টান্তে বাল্যকাল হইতেই ফলফুলের বাগানের প্রতি তাঁহার খুব আকর্ষণ লক্ষিত হইত। এতদ্ব্যতীত পুষ্করিণীর পার্শ্বে বসিয়া ছিঁপে মাছ ধরাও তাঁহার একটি বড় আমোদের বিষয় ছিল।

কিন্তু ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে, সাধারণ বালকদের ন্যায় তিনি কেবল এই সকল খেলাধুলায়ই মত্ত থাকিতেন। গ্রামের উপকণ্ঠে কালীমন্দিরের নিকটে বোধনতলায় তিনি কখনও কখনও সঙ্গীদের লইয়া স্বরচিত শ্যামামূর্তির পূজাদিতে মগ্ন হইতেন। আবার তাঁহাদের বাটিতে প্রতি বৎসর যখন ধুমধামের সহিত শারদীয়া পূজা হইত, তখন পূজামণ্ডপে পুরোহিতের পশ্চাতে বসিয়া পূজা দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন এবং সন্ধ্যাকালে অনিমেষনয়নে মায়ের আরাত্রিক দর্শন করিতে করিতে আপনাকে কোন অজ্ঞাত রাজ্যে হারাইয়া ফেলিতেন। সঙ্গীতে তাঁহার অসাধারণ প্রীতি ছিল—সময় সময় সঙ্গীদের লইয়া গ্রামের বাহিরে এক নিভৃত স্থানে মিলিতকণ্ঠে শ্যামাসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে দেশ-কালের জ্ঞান লোপ পাইত। কাহারও মুখে নূতন শ্যামাসঙ্গীত শুনিলে তিনি তাহা শিখিয়া লইতেন এবং বৈষ্ণব ভিখারির মুখে বৃন্দাবনের মুরলীধর রাখাল-রাজের গান শুনিয়া আত্মহারা হইতেন।

পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হইলে পিতা তাঁহাকে ইংরেজি শিক্ষার জন্য দ্বাদশবর্ষ বয়সে কলকাতায় আনিলেন এবং বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটে দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুরগৃহে বাসস্থান নির্দেশপূর্বক নিকটবর্তী 'ট্রেনিং একাডেমি'তে ভর্তি করিয়া দিলেন (১৮৭৫ খ্রিঃ)। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। ভাবী বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ তখন পল্লির বালকবৃন্দের নেতা। বিদ্যালয়ে রাখাল নরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা তিন-চারি শ্রেণী নিচে পড়িলেও বয়সে উভয়ে সমান ছিলেন। রাখাল তাঁহাকে দেখিয়াই আকৃষ্ট হইলেন এবং উভয়ের মধ্যে গভীর সখ্যের উদয় হইল। দুইজনে একই সঙ্গে একই আখড়ায় কুস্তি লড়িতেন। আবার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রের আকর্ষণে একই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজেও যাতায়াত আরম্ভ হইল। এইভাবে নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকায় রাখালের অধ্যয়নে ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া চিন্তাশ্রিত পিতা প্রথমে অনুরোধ-উপরোধ এবং অবশেষে কঠোর শাসন-অবলম্বনে পাঠাদিতে পুত্রের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ফল কিছুই হইল না। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে স্থির করিলেন যে, বিবাহ দেওয়াই ইহার প্রকৃষ্ট প্রতিকার। ঘটনাক্রমে শীঘ্রই মনোমত পাত্রীও পাওয়া গেল। কোল্লগরের শ্রীযুক্ত মনোমোহন মিত্র তখন কলকাতায় কাঁসারীপাড়ার নিকটেই সিমুলিয়া পল্লিতে বাস করিতেন। বিশেষ্বরী নানী সর্বসুলক্ষণা বিবাহযোগ্যা তাঁহার

একটি ভগ্নী ছিল। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে সম্ভ্রান্ত কায়স্থকুলোদ্ভূতা এই কন্যাটির সহিত রাখালের পরিণয় হইয়া গেল। বিশ্বেশ্বরী তখনও বালিকা—বয়স প্রায় একাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মানুষ স্বাভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য জগতে কত কিছুই না করিয়া থাকে—অথচ বিধির বিধানে ফল অন্যান্যরূপ হইয়া যায়। রাখালের পিতা বিবাহ দিয়া পুত্রকে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহিলেন; কিন্তু এই বিবাহই অচিরে রাখালকে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত করিল। রাখালের জ্যেষ্ঠ শ্যালক মনোমোহন পূর্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ধর্মশীলা স্বশ্রমাতাও শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত অনুরক্তা ছিলেন। বিবাহের পর কোলগরের বাড়ি হইতে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পথে মনোমোহন একদিন শ্বশুরগৃহে আগত রাখালকে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত করিলেন।

এই শুভ লগ্নের জন্য জগদম্বা পূর্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের মন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন ঠাকুর ভাবচক্ষে দেখিলেন, বটতলায় একটি বালক দাঁড়াইয়া আছে। মনে কেমন যেন একটু খটকা লাগিল—এইরূপ দর্শন কেন হইল? ভাগিনেয় হৃদয়কে এই সন্দেহের কথা জানাইলে হৃদয় সোপ্লাসে বলিলেন, “মামা, তোমার ছেলে হবে—তাই দেখেছ!” শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মহাপুরুষ চমকিত হইয়া বলিলেন, “সে কিরে? আমার যে মাতৃযোনি! আমার ছেলে হবে কি করে?” এই প্রশ্নের উত্তর হৃদয় দিতে পারেন নাই—দিয়াছিলেন জগদম্বা। সে কথা আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি। আলোচ্যদিনে প্রতীক্ষমাণ শুদ্ধসত্ত্ব মানসপুত্র রাখালের আগমনের প্রাক্কালে ঠাকুর ভাবচক্ষে দেখিলেন—গঙ্গাবক্ষে সহসা শতদল পদ্ম বিকশিত হইয়াছে; তাহার দলে দলে অপূর্ব শোভা; চিরকিশোর রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণের করধারণ করিয়া অপর একটি অনুরূপ বালক নূপুরপায়ে শতদলের উপর নৃত্য করিতেছে; নৃত্যের অপূর্ব ছন্দে মাধুর্যসিদ্ধি উথলিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মহারা হইলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন রাখালচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ সবিস্ময়ে দেখিলেন—এই তো তাঁহার পূর্বদৃষ্ট বটতলায় দণ্ডায়মান বালক, জগদম্বার প্রদর্শিত মানসপুত্র, কমলদলে নৃত্যপরায়ণ ব্রজকিশোর শ্রীকৃষ্ণসখা! তিনি সব দেখিলেন, সব বুঝিলেন; কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠ মহামানব বাহিরে কোনও আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন না; গম্ভীরভাবে একদৃষ্টে রাখালকে নিরীক্ষণ করিয়া সঙ্গী মনোমোহনকে বলিলেন, “সুন্দর আধার!” অতঃপর অতি পরিচিতের ন্যায় তাঁহার সহিত স্নেহ-সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন, “তোমার নামটি কি?” “শ্রীরাখাল চন্দ্র ঘোষ।” ‘রাখাল’ শব্দ শ্রবণে ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের গদগদ কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, “সেই নাম! রাখাল—ব্রজের রাখাল!” পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সাদরে বলিলেন, “আবার এসো।”

এদিকে প্রথম দর্শনেই রাখালের অন্তরে বিদ্যুৎচমকের মতো কি এক উচ্ছ্বাস খেলিয়া গেল—তাহার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ এককালে এই পরমপুরুষের প্রতি নিবিড় আবেশে আকৃষ্ট হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, “ইনি কে? এই সৌম্য মহাপুরুষ কে? ইহার অনিমেঘ দৃষ্টিতে যে দিব্য মাধুরী খেলিয়া বেড়াইতেছে, উহা তো ইহলোকের নহে—ইহার নয়নসমক্ষে নিশ্চয়ই সেই নিত্যসত্য বস্তু সদা বিদ্যমান।” পথে যাইতে যাইতে রাখালের কর্ণে সেই কোমল বাণী কুহরিত হইতে থাকিল, “আবার এসো।”

প্রেমঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব আকর্ষণে রাখাল পুনর্বার দক্ষিণেশ্বরে গমনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং বিদ্যালয়ের ছুটির পর একদিন একাকী তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়াই মনে হইল তিনি যেন কতক্ষণ ধরিয়া তাহারই পথ চাহিয়া আছেন—রাখালের আগমনমাত্র অনুযোগের স্বরে কহিলেন, “তোমার এখানে আসতে এত দেরি হলো কেন?” রাখাল কি আর বলিবেন? উভয়ে তখন উভয়ের দিকে একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে এক অলৌকিক ভাবভূমিতে উপস্থিত হইয়া লীলাবিলাসে মগ্ন—ভাষায় তখন উত্তর দিবে কে? মাতৃহীন রাখাল ভাবঘনতনু শ্রীরামকৃষ্ণকে আপন জননীরূপে পাইলেন এবং রাখালের আকৃতি তখন যুবার ন্যায় হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণও তাহাকে ক্ষুদ্র বালক হিসাবে গ্রহণ করিলেন। তদবধি রাখাল প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিতে লাগিলেন এবং কখনও বা সেখানে থাকিয়া যাইতে লাগিলেন। এইকালের অপূর্ব লীলা সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “তখন রাখালের এমন ভাব ছিল, ঠিক যেন তিন-চারি বছরের ছেলে। আমাকে ঠিক মাতার ন্যায় দেখিত। থাকিত থাকিত সহসা দৌড়িয়া আসিয়া ক্রোড়ে বসিয়া পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তন্যপান করিত। বাড়ি তো দূরের কথা—এখান হইতে কোথাও এক পাও নড়িতে চাহিত না। আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর যে কিরূপ বালকভাবের আবেশ হইত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তখন যে-ই তাহাকে ঐরূপ দেখিত সে-ই অবাক হইয়া যাইত। আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীর-ননী খাওয়াইতাম, খেলা দিতাম। কত সময়ে কাঁধেও উঠাইয়াছি। তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব আসিত না।”

রাখাল সম্বন্ধে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, “রাখালের সাকারের ঘর, নরেনের নিরাকারের।” রাখাল প্রথম যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তখন নরেন্দ্রনাথের সহিত ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন এবং তাহারই প্রেরণায় সমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তদনুসারে মূর্তিপূজা বা দেবদেবী প্রভৃতিকে প্রণাম করা তাহার পক্ষে গর্হিত ছিল। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ঐসব করিতে শিখিলেন

এবং উহাই তাঁহার স্বভাবানুরূপ হওয়ায় উহাতে আনন্দই পাইতেন। রাখালের আগমনের কয়েক মাস পরেই নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই রাখালের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের অসাম্প্রদায়িকতা তঁাহাকে কপটাচারী বলিয়া রূঢ়ভাষায় ভৎসনা করেন। কোমলপ্রকৃতি রাখাল নরেন্দ্রনাথকে সমীহ করিতেন এবং তাঁহার তর্কের সম্মুখীন হইতেন না। সুতরাং এই ঘটনার পরে তিনি নরেন্দ্রনাথের নিকট যাইতে সঙ্কুচিত হইতেন। ঠাকুর ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং অনুসন্ধানের কারণে জানিতে পারিলেন। তখন নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, “দ্যাখ্, রাখালকে আর কিছু বলিস নি। সে তোকে দেখলেই ভয়ে জড়সড় হয়। তার এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে—তা কি করবে বল? সকলেই কি একেবারে গোড়া থেকে নিরাকারে বিশ্বাস করতে পারে?” এই সময়ে একদিন বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত পদাবলী কীর্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর গাত্রস্থ আবরণ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার সর্বাস্থে অশ্রু-পুলক-কম্পাদি প্রকটিত হইল। মহাভাবে তিনি বলিতে লাগিলেন, “প্রাণনাথ হৃদয়বল্লভ কৃষ্ণকে তোরা এনে দে, সুহৃদের কাজ তো বটে! হয় এনে দে, না হয় আমায় নিয়ে চল—তোদের চিরদাসী হব।” রাখাল অপলকদৃষ্টিতে সে ভাব দেখিলেন, সাগ্রহমনে সে আর্তির অনুধাবন করিলেন—আর জানিলেন যে, সাকারোপাসনা সম্বন্ধে নরেন্দ্র যাহাই বলুন না কেন, সাকার শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসম্ভূত এই সাত্ত্বিক বিকারের পশ্চাতে এমন একটা সত্য আছে, যাহা যুক্তিতর্কের অতীত।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে এইরূপ অলৌকিক লীলায় ও লীলাসন্দর্শনে মগ্ন রাখাল ক্রমেই শুধু যে অধ্যয়নে অমনোযোগী হইলেন তাহাই নহে, তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য স্ফুটতর হইতে থাকিল। পিতা আনন্দমোহন ইহাতে সুখী হইতে পারিলেন না। তিনি বিষয়ী লোক—পুত্রকেও সম্পত্তি পরিচালনে সক্ষম দেখিতে চাহেন। বালক কি অবশেষে সাধুর সঙ্গে মিশিয়া সাধু হইয়া যাইবে? প্রতিকারের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা বিফল হইলে অবশেষে একদিন দক্ষিণেশ্বরে হইতে প্রত্যাগত পুত্রকে গৃহে অবরুদ্ধ করিলেন। বাধা পাইয়া রাখালের মন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইল মাত্র এবং তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইবার সুযোগের অব্ধিষণে রহিলেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহার স্নেহের দুলালকে না দেখিয়া সাত্ত্বিকভাবে ভবতারিণীর মন্দিরে জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, “মা, রাখালকে না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। মা, আমার রাখালকে এনে দাও।” জগন্মাতা সে আর্তিতে বিচলিত হইলেন। একদিন পুত্রকে পার্শ্বে বন্দির মতো বসাইয়া আনন্দমোহন মকদ্দমার কাগজপত্র নিবিষ্টমনে দেখিতেছেন, অন্য কোন দিকে লক্ষ্য নাই, এমন সময়ে রাখাল পলায়নের উত্তম সুযোগ বুঝিয়া মৃদুপদবিক্ষেপে কক্ষত্যাগপূর্বক দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন—কিছুদিন আর ফিরিলেন না। এদিকে পিতাও তখন বৈষয়িক ব্যাপারে এতই ব্যস্ত যে

দক্ষিণেশ্বরে যাইবার অবকাশ ঘটিল না। মকদমাটি বড়ই জটিল ও উহাতে জয়লাভের আশা ছিল না; কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে আনন্দমোহনেরই জয় হইল। অতএব তদনন্তর অবসর পাইয়া যেদিন তিনি পুত্রের অন্বেষণে দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন সেদিন মন আর পূর্বের ন্যায় গুরুভারে পীড়িত নহে; উহা অনেকটা উদ্বেগশূন্য ও প্রশান্ত। হয়তো তাঁহার মনে ইহাও উদ্ভিত হইয়াছিল যে এই অপ্রত্যাশিত জয়লাভ পুত্রের সাধুসঙ্গের ফলেই হইয়া থাকিবে। বিশেষত মাতৃহীন বালকের শৈশবের অসহায় স্মৃতি জাগরিত হইয়া আনন্দমোহনের মনকে সবিশেষ কোমল করিয়া তুলিল।

আনন্দমোহনকে দূর হইতে দেখিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ অনুমানে বুঝিলেন, ইনিই রাখালের পিতা হইবেন; কাজেই রাখালকে বলিলেন, “ওরে রাখাল, ঐ তোর বাপ আসছে বুঝি—দেখ্ দেখি।” দেখিয়াই ভীতচকিত রাখাল আত্মগোপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর কিন্তু বলিলেন, “ভয় কি? বাপ-মা প্রত্যক্ষ দেবতা। তোর বাপ এলে তুই বেশ ভক্তি করে প্রণাম করবি। মার ইচ্ছা হলে কী না হতে পারে?” রাখাল বিনয়নম্রচিত্তে পিতাকে অভিবাদন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও পিতার নিকট পুত্রের অজস্র প্রশংসা করিলেন এবং আদর আপ্যায়নে পিতাকে পরিতুষ্ট করিলেন। পুত্রের প্রতি ঠাকুরের যত্নের পরিচয় পাইয়া এবং পুত্রের উৎফুল্ল বদন ও সোম্মাস গতি দেখিয়া এই স্নেহের নীড় হইতে তাহাকে বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন করিতে আনন্দমোহনের প্রবৃত্তি হইল না। রাখালকে দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়াই তিনি বিদায় লইলেন—শুধু প্রার্থনা করিয়া গেলেন, ঠাকুর যেন ইচ্ছামত রাখালকে গৃহে পাঠাইয়া দেন। ঠাকুর তদনুসারে রাখালকে গৃহে পাঠাইলেও রাখাল পুনঃ পুনঃ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাই আনন্দমোহনও পুত্রকে লইয়া যাইবার জন্য মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। এইরূপ এক সুযোগে রাখালের প্রতি আনন্দমোহনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ঠাকুর বলিলেন, “আহা আহা! দেখ দেখ, আজকাল রাখালের কি চমৎকার ভাব হয়েছে! ওর মুখপানে চাও, দেখতে পাবে ঠোঁট নড়ছে—অন্তরে অন্তরে সর্বদাই ভগবানের নামজপ করে কি না! যদি বল বিষয়ীর ঘরে জন্ম, জন্ম থেকে বিষয়ী লোকের সঙ্গ, তবু এমন কেমন করে হয়? তার মানে আছে। ছোলা যদি আবর্জনাতেও পড়ে, তবু সেই ছোলা-গাছই হয়। সে ছোলাতে কত ভাল কাজ হয়। তা রাখাল যে এখানে আসে তাতে কি আপনার অমত আছে?” প্রশ্ন শুনিয়া আনন্দমোহন ফাঁপরে পড়িলেন। সাধুর বিরাগভাজন হইবেন কিরূপে? বিশেষত তিনি দেখিলেন যে, ঠাকুরের নিকট অনেক গণ্যমান্য লোকের যাতায়াত আছে। পুত্র এখানে থাকিলে ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনা। এই সকল কথা ভাবিয়া তিনি বলিলেন, “সে কি মশায়, রাখাল তো

আপনারই ছেলে। আপনার কাছেই থাক, তবে মাঝে মাঝে দু-একদিনের জন্য আমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন।” এইরূপে মধ্যে মধ্যে স্বগৃহের সংস্পর্শ ঘটিতে থাকিলেও রাখালের মনে ধর্মানুষ্ঠানস্পৃহা ক্রমেই প্রবলতর হইতে থাকিল। একদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি পিতার উচ্ছিষ্ট কিংবা ভুক্তাবশেষ-পাত্র খাইতে পারেন কিনা। অমনি ঠাকুর বলিলেন, “সে কিরে? তোর কি হয়েছে যে তোর বাবার পাতে খাবি না? মা-বাপ কি কম জিনিস? তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্ম-টর্ম কিছুই হয় না। চৈতন্যদেব তো প্রেমে উন্মত্ত—তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধরে মাকে বোঝান। বললেন—মা, আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দেব।”

এইভাবে প্রায় দুইবৎসর অতীত হইল। এদিকে জামাতার বৈরাগ্যদর্শনে প্রতিবেশীরা রাখালের স্বশ্রমাতা শ্যামাসুন্দরীকে সততই সাবধান করিয়া দিতে থাকিলেন। ঐ কারণেই হউক কিংবা কন্যাকে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে উপস্থিত করিবার জন্যই হউক, রাখালের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে শ্যামাসুন্দরী একদিন বিশ্বেশ্বরীর সহিত তথায় আসিলেন। কিন্তু বারংবার পীড়াপীড়ি করিলেও রাখাল দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। ঐ দিনের ঘটনা সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “রাখাল তখন ঘরের ছেলের মতো আছে। জানি, আর ও আসক্ত হবে না। বলে, ‘সব আলুনী লাগে।’ ওর পরিবার এখানে এসেছিল—বয়স চৌদ্দ বৎসর।...ও গেল না। বিবাহ করিলেও রাখাল যে আবদ্ধ হইবেন না, ইহা ঠাকুর ইতঃপূর্বেই বধূকে পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছিলেন। বিবাহের অল্প পরে সেদিনও ঠিক এইভাবেই শ্যামাসুন্দরী বালিকাকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে ঠাকুর বধূকে সহজভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সহসা মনে প্রশ্ন জাগিল, “বধূর সংস্পর্শে আমার রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হবে না তো?” তাই সংশয়ের নিরসনকল্পে বালিকাকে নিকটে আনাইয়া তিনি তাহার কেশরাশি ও গঠনভঙ্গি পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, “ভয়ের কারণ নেই—দেবীশক্তি। স্বামীর ধর্মপথের অন্তরায় কখনও হবে না।” তখন হৃষ্টচিত্তে নহবতে মাতাঠাকুরানীর নিকট প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন, “টাকা দিয়ে যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে।”

ঠাকুর জানিতেন, তাহার মানসপুত্র সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল। তিনি ‘গোপাল’ ‘গোপাল’ বলিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে খাওয়াইতেন, আর কত ভাবেই না আদর করিতেন। অপরের অন্যায় দেখিলে ঠাকুর শাসন করিতেন। কিন্তু রাখালের অবাধ্যতায় বিরক্ত না হইয়া বরং আনন্দ করিতেন। একদিন আহারের পর ঠাকুর বলিলেন, “ওরে রাখাল, পান সাজ না, পান নেই যে!” মানসপুত্র উত্তর দিলেন, “পান সাজতে জানি নে।” “সে কিরে? পান সাজবি, তার আবার জানাজানি কি,

যা, পান সেজে আন।” “পারব না, মশায়”—জবাব শুনিয়া ঠাকুর হাসিয়া আকুল। এরূপ সপ্রতিভ ব্যবহারে ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন রাখাল সত্যসত্যই তাঁহাকে একান্ত আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে—তাঁহার আচরণে কোনও কৃত্রিমতা নাই, আছে শুধু স্নেহসম্পন্ন আবদার। কিন্তু এইরূপে ক্ষেত্রবিশেষে তাঁহার ব্যবহার ঠাকুরের কৌতুক উদ্দীপিত করিলেও রাখাল যে সততই শাসনের অতীত ছিলেন তাহা নহে। একদিন ৩কালীমন্দির হইতে প্রসাদী মাখন আসিয়াছে; রাখাল ক্ষুধিত ছিলেন, তাই অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই মাখনের ডেলাটি তুলিয়া মুখে দিলেন। ঠাকুর অমনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “তুই তো ভারী লোভী! এখানে এসে কোথায় লোভত্যাগে যত্ন করবি, তা না করে আপনি নিয়ে খেলি?” লজ্জায় রাখালের মুখ আরক্তিম হইল। অপর একদিন একটি পয়সা দেখিয়া রাখাল কুড়াইয়া লইলেন—ইচ্ছা, কোন ভিক্ষুক বা অন্ধ-খঞ্জকে দিবেন। তিনি ঠাকুরকে সরলভাবে সব কথাই জানাইতেন; সুতরাং ইহাও নিবেদন করিলেন। ঠাকুর কিন্তু শুনিয়াই ভৎসনার সুরে বলিলেন, “যে মাছ খায় না, সে মাছের বাজারেই বা যাবে কেন? তোর যখন নিজের কোন দরকার নেই, তখন তুই কেন ঐ পয়সা ছুঁতে গেলি?”

ঠাকুর নিজে বিশেষ স্থলে শাসন বা সাবধান করিয়া দিলেও, অপরে রাখালকে কোন রূঢ় কথা বলিবে ইহা একান্ত অসহনীয় ছিল। মানসপুত্রকে অন্য কেহ শাসন করিলে স্নেহবিগলিতকণ্ঠে বলিতেন, “রাখালের দোষ ধরতে নেই, ওর গলা টিপলে দুধ বেরোয়।” আবার কেহ কোন কাজের আদেশ দিলে বলিতেন, “আহা! ও দুধের ছেলে, ওকে তোরা কোন কাজ করতে বলিস নি। ওর বড় কোমল স্বভাব!”

ঠাকুরের সঙ্গগুণে রাখাল সাধুচিত সদাচারও শিখিয়াছিলেন। একবার জনৈক অনুরাগীর গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর প্রিয় পুত্রের সঙ্গে সেখানে যান। তথায় ভজনাদি শেষ হইবার পর আহারের বন্দোবস্ত হইল। গৃহকর্তা আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকায় ঠাকুরের কোন খোঁজ লইতেছেন না দেখিয়া ঠাকুর সহাস্যে রাখালকে বলিলেন, “কই রে, কেউ ডাকে না যে রে!” এরূপ ব্যবহারে সম্ভ্রান্তবংশসম্প্রদায় রাখাল অপমান বোধ করিয়া বিরক্তিসহকারে বলিলেন, “মশায়, চলে আসুন।” ঠাকুরের নিকট কিন্তু মানাপমান সমান; তিনি সহাস্যে বলিলেন, “আরে রোস, গাড়ি-ভাড়া তিন টাকা দু আনা কে দেবে? রোক করলেই হয় না। পয়সা নেই আবার ফাঁকা রোক! আর এত রাতে খাই কোথা!” অগত্যা রাখাল নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে আহারের আহ্বান আসিলে দেখা গেল যে, বসিবার স্থান পূর্ব হইতেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং অতিকষ্টে একটা অপরিষ্কার স্থানে ঠাকুরকে বসানো হইল। আহারশেষে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পথে তিনি

রাখালকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, গৃহস্থেরা অজ্ঞানবশত অনেক সময় সাধুর সহিত যথোচিত ব্যবহার করিতে পারে না; তবু সাধু তাহাদের দোষ না দেখিয়া কেবল কল্যাণচিন্তাই করিবে। কিছু না খাইয়া আসিলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়—সাধুর ঐরূপ করিতে নাই, অন্তত এক গ্লাস জল চাহিয়াও খাওয়া উচিত।

ঐ সময়ে তথায় আগত ভক্তগণ ধ্যানজপাদিতে রত থাকিতেন এবং আপন অনুভূতির কথা ঠাকুরের শ্রুতিগোচর করাইতেন। শুনিতে শুনিতে রাখালের আগ্রহ হইল, তাঁহারও ঐরূপ অনুভূতি হউক। একদিন ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে তৈল-মর্দন করিতে করিতে ঐ বিষয়ে ধরিয়া বসিলেন এবং ঠাকুর সম্মত হইতেছেন না দেখিয়া বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তখন সেই অবাঞ্ছিত আগ্রহের নিবৃত্তির জন্য এমন এক মর্মান্তিক কথা বলিলেন যে, রাখাল তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিয়া চলিলেন। কিন্তু উদ্যান-দ্বার অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে সহসা তাঁহার চরণদ্বয় অবশ হইল—তিনি মৌনবিস্ময়ে বসিয়া পড়িলেন। এমন সময়ে ঠাকুরের নিকট হইতে রামলাল-দাদা আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। অগত্যা তাঁহাকে ফিরিতে হইল। ঠাকুর তখন সকৌতুকে বলিলেন, “কি, গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে পারলি?” সেই দিন বিকালে আবার সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, “তুই রাগ করেছিলি? তোকে রাগালুম কেন, এর মানে আছে। ঔষধ ঠিক পড়বে বলে। পিলে মুখ তুললে পর মনসার পাতা-টাতা দিতে হয়!” আর একবার রাখাল দক্ষিণেশ্বর হইতে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর অধর সেনের গৃহে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “এখানকার শ্রাবণ মাসের জল নয়। শ্রাবণ মাসের জল ছড় ছড় করে আসে, আবার বেরিয়ে যায়। এখানে পাতাল-ফোঁড়া শিব, বসানো শিব নয়। তুই রাগ করে দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে এলি, আমি মাকে বল্লুম—মা এর অপরাধ নিসনি।”

কিছুদিন পরেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদসেবা করিতে করিতে রাখাল অন্তররাজ্যে ডুবিয়া বাহ্য সংজ্ঞা হারাইলেন। ঠাকুর পরে ভক্তদিগকে ঐ স্থানটি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, “এইখানে বসে পা টিপতে টিপতে রাখালের প্রথম ভাব হয়েছিল। একজন ভাগবতের পণ্ডিত এই ঘরে বসে ভাগবতের কথা বলছিল। সেই সকল কথা শুনতে শুনতে রাখাল মাঝে মাঝে শিউরে উঠতে লাগল—তারপর একেবারে স্থির!”

ঠাকুরের কৃপায় বহুপ্রার্থিত অলৌকিক অনুভূতিতে অধিকারী হইলেও রাখালের মনে একটা অতৃপ্তি রহিয়া গেল। তিনি চাহেন, ইচ্ছামাত্র ভগবদ্ভাষে বিভোর হইয়া নানাবিধ দর্শনাদিতে সময় অতিবাহিত করিবেন। অপরের ঐরূপ হয়, তাঁহার কেন হইবে না? সুতরাং একদিন ঠাকুরকে বলিলেন, “কই, আমার তো ওদের মতো

কোন দর্শনাদি হয় না?” ঠাকুর বলিলেন, “একটু ধ্যানজপ নিয়মিত করলে এ রকম দর্শন হয়।” তাঁহার কথায় রাখাল সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রথমত উহাতে কোন রসবোধ না হওয়ায় সাধনে শৈথিল্য দেখা গেল। ঠাকুর ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “খুব রোক চাই—তবে সাধনা হয়।” অতঃপর একনিষ্ঠসাধক রাখাল একদিন ঠাকুরের সহিত ঐকালীমন্দিরে গিয়াছেন; ঠাকুর গর্ভমন্দিরে উপবেশন করিলে তিনি নাটমন্দিরে বসিয়া জপ করিতে করিতে দেখেন, সহসা গর্ভমন্দির অপরূপ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং ক্রমে সেই তীব্র স্নিগ্ধজ্যোতি মন্দিরদ্বার অতিক্রমপূর্বক তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভীত-চকিত রাখাল অমনি আসন ছাড়িয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে ঠাকুরের গৃহে চলিয়া গেলেন। ঠাকুর স্বগৃহে ফিরিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, “তুই না বলিস, তোর দর্শন-টর্শন কিছু হয় না? আবার কিছু দেখলেও ভয়ে পালিয়ে আসবি? তা হলে কি করবি বল?” আর একদিন রাখাল নাটমন্দিরে ধ্যানে মগ্ন আছেন; এমন সময় ঠাকুর উপনীত হইয়া বলিলেন, “এই নে তোর মন্ত্র, আর ঐ দেখ তোর ইষ্ট।” রাখাল সত্য সত্যই সেইক্ষণে মন্ত্রলাভ করিয়া এবং ইষ্টমূর্তির দর্শনপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। অপর একদিন তিনি বহু চেষ্টায় মন স্থির করিতে না পারিয়া বিষণ্ণচিত্তে আপন দূরদৃষ্টের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে আসন ত্যাগ করিলেন। ঠিক তখনই ঠাকুর তথায় আগমনপূর্বক অকস্মাৎ আসন ছাড়িবার কারণ জানিতে চাহিলেন এবং সব শুনিয়া বিড় বিড় করিতে করিতে রাখালের জিহ্বায় তিনটি রেখা টানিয়া দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে রাখালের অন্তরে শান্তির নির্ঝর প্রবাহিত হইতে থাকিল।

ক্রমে সাধনানিষ্ঠ রাখালের এমন অবস্থা হইল যে, তিনি দৈনিক কার্যে পর্যন্ত মনোনিবেশ করিতে পারেন না। ঠাকুর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “রাখালের এমন স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, তাকে আমায় জল দিতে হয়; সেবা করতে পারে না।” সংসারে বৈরাগ্যও তখন এমন উচ্চ স্তরে উঠিয়াছে যে, রাখাল ঠাকুরকে বলিতেন, “সংসার আমার আলুণী লাগে—সময় সময় তোমাকেও আমার ভাল লাগে না।”

দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। এই সময় রাখাল প্রায়ই জ্বরে আক্রান্ত হইতেন। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে মাঝে মাঝে কলকাতায় যাইয়া থাকিতে হইত। কিন্তু তিনি পিতৃগৃহে না যাইয়া বলরাম মন্দিরে বা অধর সেনের বাটিতে অবস্থান করিতেন। এই সময়ে তাঁহার চিত্তেও একটা আলোড়ন চলিতেছিল। ঠাকুর বলিয়াছেন, “রাখালের মনে তখন বালকের মতো হিংসাও ছিল। তাই আমার মনে কখনও কখনও তার জন্য ভয় হতো। কারণ মা (জগদম্বা) যাদের এখানে আনছেন, তাদের উপর হিংসা করে পাছে তার অকল্যাণ হয়।” নবাগতরা ঠাকুরের

স্নেহভাগী হইবে—ইহা রাখালের সহ্য হইত না। এই অবস্থা যখন চলিতেছে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ একদা ভাবচক্ষে দেখিলেন, মা যেন রাখালকে সরাইয়া দিতেছেন; অমনি সচকিতে মাকে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইলেন, “মা ওকে হৃদের মতো সরাসনি; মা, ও ছেলেমানুষ, বোঝে না—তাই কখনও কখনও অভিমান করে। যদি তোর কাজের জন্য ওকে এখান থেকে কিছুদিনের জন্য সরিয়ে দিস, তাহলে ভাল জায়গায় মনের আনন্দে ওকে রাখিস।” যাহা হউক, রাখাল কলকাতায় ভক্তগৃহে কিছুদিন আনন্দেই কাটাইলেন। কিন্তু সর্বপ্রকার যত্নসত্ত্বেও শরীর সুস্থ হইল না। ঠিক সেই সময় বলরামবাবু বৃন্দাবনে যাইতেছিলেন। তিনি রাখালকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলে ঠাকুর সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন। তদনুসারে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে রাখাল ব্রজধামে উপস্থিত হইলেন। সৌন্দর্যনিলয় ও ভাবগম্ভীর ব্রজধামে রাখাল বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলেন। এই সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন, আর এই সেই যমুনাপুলিন! এখানে কুঞ্জে কুঞ্জে ময়ূরময়ুরী নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। এই স্বভাবসুন্দর ধামে রাখালের মনের ন্যায় শরীরও প্রথম কিছুদিন বেশ ভালই ছিল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে আবার জ্বর হইল। সংবাদ পাইয়া উদ্বিগ্নমনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “রাখাল সত্য সত্যই ব্রজের রাখাল। যে যেখান থেকে এসে শরীরধারণ করে, সেখানে গেলে প্রায়ই তার শরীর থাকে না।” তাই আকুলকণ্ঠে মাকে জানাইলেন, “মা, কি হবে? তাকে ভাল করে দে; সে যে ঘর-বাড়ি ছেড়ে আমার উপর সব নির্ভর করেছে!”

ঠাকুরের প্রার্থনা মা শুনিলেন। তিন মাস পরে নভেম্বরের শেষভাগে অপেক্ষাকৃত উত্তম স্বাস্থ্য লইয়া রাখাল বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক পুনঃ ঠাকুরের সেবায় রত হইলেন। কিন্তু দৈবক্রমে মাসেক পরেই তিনি আবার অসুখে পড়িতে লাগিলেন। ঠাকুরও তখন সর্দি প্রভৃতি রোগে পীড়িত। রাখাল জানিতেন যে, ঠাকুর তাঁহার বিষয়ে সর্বদাই চিন্তিত থাকেন। রুগ্ণ শরীর লইয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিলে ঠাকুরের উদ্বিগ্নবৃদ্ধি হইবে মাত্র। সেরূপ দুশ্চিন্তা যাহাতে না হয় তাহাই করা উচিত—এই ভাবিয়া তিনি ঠাকুরকে স্থায় মনোভাব না জানাইয়াই পিতৃগৃহে চলিয়া গেলেন এবং সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের আশায় সেখানেই রহিয়া গেলেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, রাখাল বাড়িতে না যাইতে চাহিলেও ঠাকুর তাঁহাকে মাঝে মাঝে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া হতশাবকা বিহঙ্গীর ন্যায় ছটফট করিয়া দিন কাটাইতেন। রাখাল প্রথমে খুব আপত্তি জানাইলেও ক্রমে যাতায়াতের ও গৃহে অবস্থানের কাল বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বিশেষরূপে সহিত তাঁহার ব্যবহারাদিও অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া উঠে। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “তার পরিবারের কাছে তাকে

আমিই পাঠিয়ে দিতাম—একটু ভোগ বাকি ছিল।” রাখালের সহজ ব্যবহার দর্শনে পরিবারস্থ লোকেরা আশ্বস্ত হইয়া রাখালকে কর্মে প্রবৃত্ত করাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। রাখাল এই সংবাদ ঠাকুরের কর্ণগোচর করাইলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “ঈশ্বরের জন্য গঙ্গায় বাঁপ দিয়ে মরেছিস, একথা বরং শুনব, তবু কারুর দাসত্ব করিস, চাকরি করিস—একথা যেন না শুনি।” আত্মীয়-স্বজন কিন্তু ছাড়েন নাই, তাঁহারা যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে, নিজের জন্য না হইলেও পরিবারের জন্য অর্থোপার্জন করা উচিত, কারণ পরিবারের প্রতি তো একটা কর্তব্য আছে। সরলভাবে রাখাল তাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আমার পরিবারের কি হবে?” এই প্রশ্নে ঠাকুরকে নিরন্তর থাকিতে দেখিয়া রাখাল গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। যাহা হউক, স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া এবং হয়তো অলৌকিক বিধানে বাকি ‘একটু ভোগ’ শেষ করিবারই জন্য তিনি অধুনা এইরূপ সন্দেহদোলায়মান-চিন্তে এখন গৃহে অবস্থান করিতে থাকিলেন। এদিকে ঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে ভক্তদের বলিলেন, “রাখাল এখন পেন্সন খাচ্ছে। বৃন্দাবন থেকে এসে এখন বাড়িতে বাস করছে।” রাখাল এইভাবে কিছুদিন স্বগৃহে বাস করিয়া সুস্থ হইবামাত্র দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন করিলেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্তী ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে ব্রহ্মচক্র রচনাপূর্বক সাধন করিতে অভিলাষ হইয়াছে। তারপর ঠাকুরের অনুমতিক্রমে তাঁহারই কক্ষে কৃষ্ণচতুর্দশীর গভীর রাত্রে রাখাল, মাস্টার, কিশোরী প্রভৃতিকে লইয়া তিনি ধ্যানে বসিলেন। ধ্যানে রাখালের ভাবাবস্থা উপস্থিত হইলে ঠাকুর সেই রাত্রে তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইয়া বাহ্যসংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। ইহার দিন দুই পরে ঠাকুর মৌনাবলম্বন করেন এবং মৌনভঙ্গে বলেন, “মা দেখিয়ে দিচ্ছিলেন ভক্তদের কার কতটা হয়েছে।” জিজ্ঞাসিত হইয়াও তিনি অধিক কিছু বলেন নাই। পরে শরৎকে বলিয়াছিলেন, “রাখালের সম্বন্ধে মা কত দেখাইয়াছেন! তাহার অনেক কথা বলিতে নিষেধ আছে।”

ইহার দুই মাস পূর্বেই ঠাকুরের গলরোগের বৃদ্ধি হইয়াছিল। যথাসময়ে তাঁহাকে চিকিৎসার্থ কাশীপুরে আনা হইলে রাখালও তথায় আসিয়া সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। সেবার সহিত ত্যাগী ভক্তদের জীবনে এখন চলিল এক অপূর্ব সাধনা—সংসারের চিন্তা ক্রমেই তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। কাশীপুরে আসার কিছুদিন পরেই মনোমোহন ঠাকুরকে জানাইলেন যে, রাখালের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। রাখাল পার্শ্বেই ছিলেন, তিনি সব শুনিলেন; কিন্তু তখন মায়িক সংসারের ঘটনাবলী তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও রেখাপাত করিত না; সেজন্য এই

সংবাদে তাঁহার বৈরাগ্যজনিত প্রশান্তির কোন হাস লক্ষিত হইল না—তিনি পূর্বেরই ন্যায় দিবসে সেবা ও রাত্রে ধ্যানজপে মগ্ন রহিলেন। ঠাকুর ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “রাখাল-টাখাল এখন বুঝেছে, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ; কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা। পরিবার আছে, ছেলেও হয়েছে—কিন্তু বুঝেছে যে, সেসব মিথ্যা, অনিত্য। রাখাল-টাখাল এরা সংসারে লিপ্ত হবে না।”

লীলাবসানে উন্মুখ ঠাকুর এই সময়ে ভাবী রামকৃষ্ণসঙ্ঘ-গঠনের জন্য প্রায় প্রত্যহ নরেন্দ্রকে গোপনে ডাকিয়া নানা উপদেশ দিতেন। একদিন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, “রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছা করলে সে একটা রাজ্য চালাতে পারে।” কে জানে, এই বাক্যে নরেন্দ্র কিসের ইঙ্গিত পাইলেন! অনন্তর একদিন তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে বলিলেন, “আজ হতে আমরা রাখালকে ‘রাজা’ বলে ডাকব।” ঠাকুরের কানে ঐ কথা উঠিলে তিনিও সানন্দে বলিলেন, “রাখালের ঠিক নাম হয়েছে।” তদবধি গুরু-ভ্রাতাদের নিকট তিনি ‘রাজা’ বলিয়াই পরিচিত হইলেন; কিন্তু পরে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে তাঁহার সর্বজন-পরিচিত নাম হইয়াছিল ‘মহারাজ’। আমরাও তাঁহাকে মহারাজ বলিয়াই উল্লেখ করিব।

ঠাকুরের রোগের উপশম হইতেছে না দেখিয়া মহারাজ প্রভৃতি সকলেই তখন বিশেষ চিন্তিত থাকিলেও হৃদয়ে আশা পোষণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যুত একদিন নরেন্দ্র ও মহারাজের মুখে আদরে হাতে বুলাইতে বুলাইতে স্নেহবিগলিতস্বরে তিনি তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন, “শরীরটা কিছুদিন থাকত তো লোকদের চৈতন্য হতো। তা রাখবে না, সরল মূর্খ দেখে লোক সব ধরে পড়ে—সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে! একে কলিতে ধ্যানজপ নেই।” মহারাজ শ্রবণমাত্র মর্মভেদী কাতরস্বরে অনুনয় করিয়া বলিলেন, “আপনি বলুন, যাহাতে আপনার শরীর থাকে। নির্বিকার মাতৃচালিত মহাপুরুষ শুধু বলিলেন, “সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।”

বিশ্বাস ভাঙ্গিলেও আশা যায় না; আর ভক্ত কখনও ঠাকুর-সেবায় বিরত হয় না। পূর্বোক্ত ঘটনার পরেও মহারাজ একমনে সেবা করিয়া যাইতে লাগিলেন। এমন কি, সাধনার প্রবল উচ্ছ্বাসে গুরুভ্রাতাদের কেহ কেহ তীর্থদর্শন ও তপস্যাদিতে বহির্গত হইলেও তিনি স্থিরভাবে একটানা কাশীপুরেই অবস্থান করিলেন। ঐ সময়ে ঠাকুর যুবক ভক্তদিগকে মধ্যে মধ্যে ভিক্ষাঘেষণে বাহিরে পাঠাইতেন—বলিতেন, “ভিক্ষার অন্ন শুদ্ধ।” তদনুসারে একদিন লাটু ও মহারাজ ভিক্ষায় চলিলেন। যাইবার সময় ঠাকুর বলিয়া দিলেন, “কেউ গাল দেবে, আর কেউ আশীর্বাদ করবে, হয়তো আবার কেউ পয়সাও দেবে—তোরা সব নিবি।” পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যগুলি রক্ষন করাইয়া স্বয়ং সেই অন্নের আশ্বাদ গ্রহণ করিলেন।

কাশীপুরের একটি ঘটনায় মহারাজের তৎকালীন উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এক পাগলী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিত। কাশীপুরেও তাহার উৎপাত আরম্ভ হইলে নিরঞ্জনাদি ভক্তেরা তাহার ঠাকুরের নিকট উপরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তবু সে নিষেধ মানিতে চাহে না। একদিন শশী শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখেই মহারাজকে বলিতেছিলেন, “এবার পাগলী এলে ধাক্কা মেরে তাড়াতে হবে।” অহেতুক-কৃপাসিদ্ধ ঠাকুর অমনি ইঙ্গিতে বলিলেন, “না না, সে আসবে আর দেখে চলে যাবে।” মহারাজেরও মনোভাব ছিল, “যেমন করেই হোক, পাগলী ঠাকুরের কথাই তো চিন্তা করছে; সুতরাং আমরা বিরক্ত হব কেন?” পরন্তু এ প্রকার যুক্তিতে আস্থাহীন শশী বলিলেন, “কিন্তু অসুখের সময় কেন আর ওরকম উপদ্রব!” মহারাজ প্রেমার্দ্ৰ-হৃদয়ে উত্তর দিলেন, “উপদ্রব সবাই করে। সকলেই কি খাঁটি হয়ে ওঁর কাছে এসেছে? ওঁকে আমরা কষ্ট দিইনি? নরেন্দ্র-টরেন্দ্র আগে কি রকম ছিল! কত তর্ক করত! ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছে! ধরতে গেলে কেহই নির্দোষ নয়।” অতঃপর পাগলীর কথা উল্লেখ করিয়া আবার বলিলেন, “দুঃখ হয় যে, সে উপদ্রব করে। আর তার জন্য অনেকে কষ্টও পায়।”

অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসংবরণ করিলেন। মহারাজের হৃদয়ে আজ পিতার সম্পত্তি, যুবতী ভার্যা, শিশুপুত্র—কেহই স্থান পাইল না, সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া রহিল শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি এবং এক অননুবর্ণনীয় ব্যথা। কিন্তু কাল বড়ই নিষ্ঠুর, সে বর্তমানের কঠিন আঘাতে মানবকে জর্জরিত করিয়া জানাইয়া দেয় যে, অতীত সত্যই চলিয়া গিয়াছে। শীঘ্রই ঠাকুরের শেষ স্মৃতির সহিত বিজড়িত কাশীপুরের উদ্যানবাটি ত্যাগ করিয়া মহারাজকেও বলরাম-মন্দিরে আসিতে হইল। তারপর বরাহনগরে মঠ স্থাপিত হইলে তিনি যথাসময়ে সেখানে যোগ দেন।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের শেষে নরেন্দ্রাদি যখন আঁটপুরে যান তখন রাখাল অন্যত্র থাকায় সেখানে যাইতে পারেন নাই। ইহাতে বাবুরামের মাতাঠাকুরানী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন; তাই রাখাল, বাবুরাম ও বুড়োগোপালকে লইয়া নরেন্দ্র পুনর্বার সেখানে যান। আঁটপুরের একটি যুবক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিল। সে মহারাজের ধ্যান-তন্ময়তা দেখিয়া ও তাঁহার সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে। আঁটপুর হইতে ফিরিয়া যথাকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে মহারাজের নাম হইল ব্রহ্মানন্দ। তাঁহার সন্ন্যাস যে শুধু একটা বাহ্য আড়ম্বর ছিল না, পরন্তু অন্তরের বৈরাগ্যোজ্জ্বল গৈরিক রাগের বহিঃপ্রকাশস্বরূপ ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল বরাহনগরে একদিন তাঁহার পিতার প্রতি আচরণে। আনন্দমোহন মধ্যে মধ্যে মঠে আসিয়া পুত্রকে গৃহে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেন। মহারাজও

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ স্মরণ করিয়া পিতার প্রতি সমুচিত সম্মান ও ভালবাসা দেখাইতেন; কিন্তু গৃহে ফিরিতেন না। ইহাতে পিতা বিরত হইতেন না দেখিয়া অবশেষে তিনি নম্রভাবে অথচ স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিলেন, “কেন আপনারা কষ্ট করে আসেন? আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্বাদ করুন যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদের ভুলে যাই।” মায়িক সম্বন্ধ তিনি সত্যই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কারণ এই সময়ে অকস্মাৎ তাঁহার পত্নী দেহত্যাগ করিলে দেখা গেল যে, মহারাজ অবিচলিত আছেন। এমন কি, কয়েক বৎসর পরে (১৮৯৬-এর ২০ এপ্রিল) তাঁহার একমাত্র দশমবর্ষীয় পুত্র সত্যানন্দের মৃত্যুসংবাদেও তিনি সুমেরুবৎ অচল, অটল ও নির্বিকার ছিলেন।

বরাহনগরের মঠে অবিরাম বৈরাগ্যাগ্নি প্রজ্বলিত থাকিলেও মহারাজের কেবলই মনে হইতে লাগিল, “ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর দশজনের সঙ্গে নানাবিধ কার্য ও আলাপাদিতে লিপ্ত থাকাই চিত্তবিক্ষেপের কারণ।” সুতরাং নেতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতৃতুল্য নরেন্দ্রনাথকে একদিন একান্তে জানাইলেন, “এখানে থেকে তো কিছুই হল না! তিনি যা বলেছিলেন—ভগবদর্শন, কই হল?” গুরুভ্রাতাকে নিরন্তর দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, “চল, নর্মদায় বেরিয়ে পড়ি।” এবারে নেতা উত্তর দিলেন, “বের হয়ে কি হবে? জ্ঞান কি হয়, তাই জ্ঞান জ্ঞান করছিস?” ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, “‘মুক্তি ও তাহার সাধন’ বইখনিতে আছে—সন্ন্যাসীদের একসঙ্গে থাকা ভাল নয়।” নরেন্দ্র নীরব রহিলেন; কারণ ইহাই তো ভারতের চিরন্তন ধারা যে, সন্ন্যাসী নির্জনে ভগবচ্চিন্তা করিবে। নূতন কর্মপ্রণালীর চিন্তা চকিতে তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইলেও উহা তখনও স্পষ্ট আকার ধারণ করে নাই; আর সনাতন বিশ্বাসানুযায়ী তাঁহারও প্রাণ তখন তীর্থাদিদর্শন ও নির্জনবাসাদির জন্য ব্যাকুল। কিন্তু উত্তর দিতে অসমর্থ হইলেও ঠাকুরের আদরের রাখালকে তিনি তখনই যথা-তথা যাইতে দিলেন না। অনন্তর ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীশ্রীমায়ের নীলাচল-গমনকালে রাখালও সকলের অনুমতিক্রমে তাঁহার সহিত সেখানে চলিলেন।

নীলাচলে পৌছিয়া শ্রীশ্রীমা অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত বলরাম বাবুদের ‘ক্ষেত্রবাসীর মঠ’ নামক বাড়িতে থাকিলেন। ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি অপরেরা অন্যত্র অবস্থানপূর্বক ভিক্ষান্তে উদরপূর্তি করিয়া ৩জগন্নাথ-দর্শন ও ধ্যান-জপাদিতে সময় কাটাইতে লাগিলেন। পরন্তু যত্নের অভাবে মহারাজের শরীর শীর্ণ হইতেছে জানিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বিশেষ চিন্তিত রহিলেন এবং বলরামবাবুও তাঁহাকে স্বগৃহে আনিবার জন্য আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। রাখাল বুঝিতে পারিলেন যে, এইরূপ

অবস্থায় তাঁহার পক্ষে দীর্ঘকাল স্বেচ্ছানুসারে আহার-বিহার ও তপস্যাদি করা সম্ভব হইবে না। অতএব কয়েকমাস পরেই পুরী হইতে কটক হইয়া তিনি বরাহনগর মঠে চলিয়া আসিলেন।

মহারাজের নির্জন-তপস্যার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত না হইয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং আত্মপ্রকাশের সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকিল। অবশেষে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি উত্তরাখণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহচররূপে সুবোধানন্দকেও পাঠাইলেন। মহারাজ ও সুবোধানন্দ ঐবেদ্যনাথ দর্শনাশ্রমে বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে পিশাচমোচন-পল্লিতে শ্রীযুক্ত প্রমদাদাসবাবুর এক নির্জন উদ্যানবাটিতে অবস্থানপূর্বক সত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা তপস্যায় মগ্ন হইলেন। এইরূপে মাঘ মাস পর্যন্ত তথায় কাটাইয়া স্বামী সুবোধানন্দ ও অপর একজন বাঙালি পরিব্রাজকের সহিত মহারাজ নর্মদা তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই নর্মদাতীরে মহারাজ একাদিক্রমে ছয়দিন গভীর অতীন্দ্রিয় ভাবে নিমগ্ন থাকিয়া এককালীন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি পঞ্চবটী প্রভৃতি সুপ্রাচীন ও সুপবিত্র তীর্থাদি দর্শন ও তত্তৎস্থলে কিয়ৎকাল ধ্যান-জপাদিতে অতিবাহিত করিয়া বোম্বাই হইয়া শ্রীদ্বারকাধাম যাত্রা করিলেন। এই যাত্রাকালে এবং সৌরাষ্ট্রে ভ্রমণকালে মহারাজের অপ্রতিগ্রহ ও নিঃস্পৃহা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। বোম্বাই শহরে শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত শ্রীকালীপদ ঘোষ (দানা-কালী) তাঁহাদিগকে নিজের আবাসে লইয়া যাইতে চাহিলে ব্রহ্মানন্দ উহাতে অস্বীকৃত হন এবং শ্রীশ্রীমুন্দাদেবীর মন্দিরসংলগ্ন এক নিভৃত স্থানে প্রায় সাত-আট দিন থাকিয়া দ্বারকাগমনার্থ জাহাজে উঠেন। যাত্রাকালে তাঁহার তেজঃপুঞ্জ লাবণ্যময় ধ্যানগম্ভীর মূর্তি সন্দর্শনে জনৈক ভাটিয়া মহাজন তীর্থদর্শনের জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ দিতে চাহিলে মহারাজ অস্বীকৃত হন। অগত্যা শেঠজী তিনখানি টিকেট কিনিয়া সুবোধানন্দের হস্তে অর্পণ করেন।

দ্বারকাধামে তীর্থযাত্রীরা পুণ্যতোয়া গোমতীর জলে স্নান করিয়া থাকেন; কিন্তু তজ্জন্য প্রত্যেককে রাজসরকারে দুই টাকা মাশুল দিতে হয়। নিঃসম্বল স্বামী ব্রহ্মানন্দাদির নিকটও ঐরূপ অর্থ চাহিলে তাঁহারা হতাশহৃদয়ে ফিরিয়া চলিলেন; অধিকন্তু জনৈক ব্যবসায়ী উপযুক্ত অর্থপ্রদানে অগ্রসর হইলে মহারাজ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, “গোমতী নদীতে স্নান অপেক্ষা তীর্থরাজ সমুদ্রে স্নান অধিকতর পুণ্যপ্রদ। বৃথা অর্থব্যয়ের আবশ্যিক নাই—আমরা বেটপুরী-সঙ্গমে সমুদ্রে স্নান করিব।” শেঠজী তাঁহার এই সারগর্ভ বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে স্বগৃহে আনয়নপূর্বক তিন দিন তাঁহাদের সেবা করিলেন এবং প্রত্যেকের হস্তে একখানি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অর্পণ করিলেন। শেঠজী তাঁহাদের তীর্থযাত্রার সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্থানে পত্র দিতেও চাহিলেন; কিন্তু মহারাজ উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। শুধু বলিলেন, “আমার কোন বস্তুর অভাব বা আবশ্যিক নাই—সাধু-সন্ন্যাসীর ঈশ্বরই একমাত্র আশ্রয় ও ভরসা।” অতঃপর শেঠজী অর্থদানের আকাঙ্ক্ষা জানাইলে উহাও অস্বীকারপূর্বক পদব্রজে সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মানন্দজী বেটদ্বারকায় উপস্থিত হইলেন এবং স্নান ও মন্দিরাদি-দর্শনান্তে সুবোধানন্দকে ধর্মশালায় ভিক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। ধর্মশালার অধ্যক্ষ ঐ জন্য বাদাম রাখিতেন। সুবোধানন্দজী ভিক্ষাস্বরূপে প্রাপ্ত কয়েক সের বাদাম লইয়া মহারাজের সম্মুখে স্থাপন করিলে বাদামের পরিমাণ দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, “এত বাদাম কে দিয়েছে?” “ধর্মশালার অধ্যক্ষ।” মহারাজ বলিলেন, “আমাদের জন্য দুই ছটাক রেখে বাকিগুলো ফিরিয়ে দিয়ে এসো।” কিন্তু সুবোধানন্দ উভয় বিপদে পড়িলেন—সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দ সঞ্চয় করিতে পরাজুখ, সাধুসেবক অধ্যক্ষ প্রতিগ্রহণে অস্বীকৃত। অগত্যা ব্রহ্মানন্দের ব্যবস্থানুসারে দুই ছটাক রাখিয়া অবশিষ্ট বাদাম দরিদ্রদের মধ্যে বিতরিত হইল। বেটদ্বারকা হইতে তাঁহারা ক্রমে সুদামাপুরী ও জুনাগড়ে গির্গার পর্বতোপরি মন্দিরাদি দর্শনান্তে আমেদাবাদে উপনীত হইলেন এবং তদনন্তর রাজপুতানার তীর্থগুলি দর্শনের জন্য প্রথমে পুষ্করতীর্থে উপস্থিত হইলেন। এখানে সঙ্গের পরিব্রাজকটি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে আজমীরের হাসপাতালে রাখিয়া কিছুদিন পরে (১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির প্রথমভাগে) ব্রহ্মানন্দ ও সুবোধানন্দ বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

বৃন্দাবনধামে মহারাজের এই দ্বিতীয়বার আগমন। স্বধামে উপস্থিত ব্রজের রাখাল ভগবদ্ভাবে বিভোর হইলেন। এইভাবে কত দিন কাটিয়া গেল, কত মহানিশার অবসান হইল—ভগবদ্ভ্যানে তন্ময় মহারাজের জ্ঞানক্ষেপ নাই। তিনি কোন দিন সুবোধানন্দের আনীত ভিক্ষায় গ্রহণ করেন, কোন দিন উহা অনাদরে পড়িয়া থাকে। কোন দিন মন্দিরে গমনপূর্বক ভাবমুগ্ধচিত্তে অনিমেষনয়নে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন, কোন দিন বা সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারান। আর রাত্রিতে নিদ্রার স্থলে ধ্যানই অধিক হইয়া থাকে। এই সময়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন। মহারাজের কঠোর তপস্যার কথা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইলে তিনি একদিন তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “পরমহংসদেব আপনাকে তো সব রকম সাধনভজন, অনুভূতি, দর্শনাদি করিয়ে দিয়েছেন; তবে আপনি এখন কেন আবার কঠোর সাধনা করছেন?” ব্রহ্মানন্দ মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, “তাঁর কৃপায় যে-সব অনুভূতি বা দর্শন হয়েছে, এখন সেগুলি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছি মাত্র।” গোসাঁইজী এইরূপ উত্তর কিভাবে লইয়াছিলেন জানি না; পরন্তু রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের

ইতিহাস পর্যালোচকের দৃষ্টিতে এবং বিধ তপস্যার গুঢ় তাৎপর্য রহিয়াছে। সঙ্ঘের অধ্যাত্ম-চেতনাকে সদা সক্রিয় রাখিতে হইলে সঙ্ঘের মর্মস্থলে এমন একটি শক্তিকেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার আবশ্যক ছিল, যাহা হইতে কর্মব্যাপ্ত অপর আধারগুলি প্রয়োজনমত আপনাদিগকে পুনঃপুনঃ পূর্ণ করিয়া লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা অব্যাহত রাখিতে পারে। ইহারই আর এক সময়ে মহারাজের জ্বর হইলে গোসাঁইজী অচিরে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া সুবোধানন্দের নিকট জানিতে পারিলেন যে, রোগীর মশারি নাই। শ্রবণমাত্র তিনি মশারি ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন এবং ভগবানের কৃপায় ব্রহ্মানন্দ শীঘ্রই নিরাময় হইলেন। ইত্যবসরে সুবোধানন্দের মন পূর্ব সংকল্পানুসারে উত্তরাখণ্ডের নিমিত্ত অতীব ব্যগ্র হইয়া পড়িল। মহারাজের নিকট ইহা জানাইলে তিনি সানন্দে তাঁহাকে যাত্রার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং বৃন্দাবনে রহিয়া গেলেন।

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে তিনি একদিন দেখিলেন যে, ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বলরামবাবু জ্যোতির্ময়দেহে হাসিতে হাসিতে দিব্যালোকে চলিয়া যাইতেছেন। পরে যথাসময়ে পত্রে জানিতে পারিলেন যে, তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন (১৩ এপ্রিল, ১৮৯০)। ইহার পরে আরও কয়েক মাস বৃন্দাবনে কাটাইয়া সেপ্টেম্বরের শেষে তিনি পদব্রজে হরিদ্বারে উপনীত হইলেন। অপর কয়েকজন গুরুভ্রাতা ঐ অঞ্চলে পূর্ব হইতেই তপস্যায় নিরত ছিলেন। ১৮৯১-এর জানুয়ারি মাসে একদিন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের সমভিব্যাহারে ব্রহ্মানন্দসকাশে আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। মহারাজ সেই আদেশ পালনপূর্বক মীরাটে গেলেন এবং সেখানে অখণ্ডানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। মীরাটে মার্চ পর্যন্ত অতিবাহিত হইলে স্বামীজী সকলকে বলিয়া নিঃসঙ্গ ভ্রমণে নির্গত হইলেন; এদিকে মহারাজও স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত এপ্রিল মাসে জ্বালামুখী তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জ্বালামুখী হইতে তাঁহারা কাংড়া, পাঠানকোট, গুজরানওয়ালা, লাহোর, মণ্টগোমারী, মুলতান ও সন্ধর হইয়া করাচীতে উপনীত হইলেন। করাচী হইতে জাহাজে বোম্বাই পৌঁছিলে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহাদের পুনর্মিলন ঘটিল। স্বামীজী তখন আমেরিকা গমনে উদ্যত; কিন্তু তৎপূর্বে খেতড়িরাজের আহ্বানে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইবে। ব্রহ্মানন্দ এবং তুরীয়ানন্দও তাঁহার সহিত গমনপূর্বক পথে আবুরোড স্টেশনে নামিয়া আবু পাহাড়ে উপস্থিত হইলেন। খেতড়ি হইতে স্বামীজীর বোম্বাই প্রত্যাগমনকালে তাঁহারা পুনর্বার আবুরোডে আসিয়া স্বল্পক্ষণের জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অতঃপর কিয়দিবস আবুপাহাড়ে যাপনান্তে তাঁহারা আবুরোডে নামিয়া আসিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের আহ্বানে অখণ্ডানন্দও বোম্বাই হইতে তথায় আসিলে তিনজনে আজমীর হইয়া জয়পুর গেলেন। সেখানে একমাস অবস্থানের

পর অখণ্ডানন্দ রাজপুতানা ভ্রমণে নির্গত হইলেন এবং মহারাজ ও তুরীয়ানন্দ বৃন্দাবনে চলিলেন।

বৃন্দাবনে আসিয়া উভয় গুরুভ্রাতা দিব্যভাবে ভাবিত হইলেন। তুরীয়ানন্দ একদিন বলিলেন, “আজ ভিক্ষা করতে বেরুব না। দেখি, রাধারানী উপবাসী রাখেন কি না।” ধ্যানে মগ্ন গুরুভ্রাতৃদ্বয়ের একদিন একরাত্রি কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গেল— কিছুমাত্র জ্ঞান রহিল না। পরদিন এক তীর্থযাত্রী অযাচিতভাবে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী দিয়া গেল। বৃন্দাবন হইতে তাঁহারা পদব্রজে নন্দগ্রাম, বর্যাণা, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরিগোবর্ধন প্রভৃতি দর্শন করিয়া কুসুমসরোবরে উপনীত হইলেন এবং ঐ স্থানটি তপস্যার অনুকূল দেখিয়া তথায় রহিয়া গেলেন। এই সময়ের কঠোর জীবনের ইতিহাস আমরা বিদিত নহি বলিলেই চলে। অন্য সময়েরই বা কতটুকু বিদিত আছি? ভাবময় ঠাকুরের মানসপুত্রের বিভিন্ন তীর্থাদিতে যে-সব সাধন, অনুভূতি বা দর্শনাদি হইয়াছিল তাহার কতটুকু আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতে পারি, আর কতটুকুই বা ভাষায় প্রকাশ করা চলে? মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, “নির্বিকল্প সমাধির পর ধর্মজীবন আরম্ভ হয়।” যে নির্বিকল্প সমাধি বহুজীবনের সাধনায় ক্রটিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে, উহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এবং উহার পরবর্তী অনুভূতিসম্পদে ভূষিত হইয়া যিনি বহু ভক্তকে ধর্মপথে পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের অতি স্থূল আভাসমাত্রই আমরা দিতে সক্ষম।

ইতোমধ্যে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকায় ও ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। ইহার ফলে মঠের কার্যবৃদ্ধির সূত্রপাত হওয়ায় মঠে চলিয়া যাইবার জন্য তাঁহাদের নিকট বারংবার আহ্বান আসিলেও তখনই যাওয়া হইল না। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে বৃন্দাবন হইতে তাঁহারা লঙ্কৌ হইয়া অযোধ্যায় গেলেন। তথায় শিবানন্দজীর মুখে মঠে ফিরিবার জন্য স্বামীজীর নির্দেশ পাইয়া তুরীয়ানন্দ আগস্ট মাসে কলকাতায় গেলেন; পরন্তু মহারাজ পুনর্বার বৃন্দাবনে ফিরিলেন। এইবারে বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি অজগর-বৃন্তি অবলম্বন করিলেন—ভিক্ষার্থে কোথাও যাইতেন না, কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না। কোনদিন আহার জুটিত, কোনদিন বা অনাহারে কাটিত। কখনও কোন শেঠ একখানি কম্বল দিয়া যাইতেন; পরক্ষণেই চোর আসিয়া উহা লইয়া যাইত। ব্রহ্মানন্দ সাক্ষিস্বরূপ সব দেখিয়া যাইতেন মাত্র। দিব্যভাবে বিভোর হইয়া কখনও তিনি বাহ্যহারা হইতেন; আবার কখনও তাঁহার দেহে অশ্রুপুলকাদি সঞ্চার হইত। এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে (নভেম্বর-ডিসেম্বর) তিনি ব্রজমণ্ডল ত্যাগ করিয়া মঠাভিমুখে চলিলেন।

মহারাজের মঠে প্রত্যাবর্তনের স্বল্পকাল পরেই অসুস্থ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে কলকাতায় আনিয়া বাগবাজারে গঙ্গার ধারে ‘গুদামওয়ালা বাড়ি’ নামক একটি ভাড়াটিয়া বাড়ির ত্রিতলে রাখা হয়। সেখানে তাঁহার সেবাদির জন্য গোপালের মা এবং গোলাপ-মাও বাস করিতেন। এতদ্ব্যতীত যোগানন্দ এবং দুই-একজন ব্রহ্মচারীও দ্বিতলে থাকিতেন। ব্রহ্মানন্দও সেই বাড়িতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানে তিনি সমাগত ভক্তদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন এবং কোন কোন ভাগ্যবানকে দীক্ষাও দিয়াছিলেন। এই সময় হইতে স্বামীজীর ভারতে প্রত্যাগমন পর্যন্ত মহারাজ অধিকাংশ সময় কলকাতায় থাকিতেন। গুদামওয়ালা বাড়ির পরে বলরাম-মন্দির ছিল তাঁহার প্রধান আবাস-স্থল।

১৮৯৭-এর প্রারম্ভে ভারতে ফিরিয়া স্বামীজী স্বাস্থ্যোদ্ধারকল্পে যখন দার্জিলিং গমন করেন, তখন ভাবী রামকৃষ্ণ মিশনের পরিকল্পনা-রচনায় সাহায্য পাইবার উদ্দেশ্যে তিনি ব্রহ্মানন্দ ও গিরিশবাবুকে সঙ্গে লইয়া যান। পরে ১ মে মিশন প্রতিষ্ঠান্তে তিনি ব্রহ্মানন্দকে কলকাতাকেন্দ্রের কার্যভার দিলেন। ইহাই প্রকৃতপক্ষে মহারাজের কর্মজীবনের সূত্রপাত। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বেলুড়ে নূতন মঠ-নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হইলে তাঁহাকে উহার দায়িত্ব লইতে হইল এবং পর বৎসর নূতন বাড়িতে মঠ উঠিয়া আসার পর তাঁহারই হস্তে উহার পরিচালনভার ন্যস্ত হইল। অবশেষে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে স্বামীজী দলিল সম্পাদনপূর্বক সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি গুরুভ্রাতাদের হস্তে তুলিয়া দিয়া ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের আরম্ভে মঠ ও মিশনের সাধারণ সভাপতির আসন ত্যাগ করিলেন। অতঃপর ঐ পদে মহারাজ নির্বাচিত হইলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “রাখাল একটা রাজ্য চালাতে পারে।” গুরুভ্রাতারা তাহা ভুলেন নাই। আরও তাঁহাদের মনে ছিল যে, মহারাজ ঠাকুরের মানসপুত্র; তাই একদিন স্বামীজী অতর্কিতে মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন, “গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।” প্রত্যুৎপন্নমতি মহারাজও ইহাতে অপ্রস্তুত না হইয়া প্রতিপ্রণাম করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, “জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা।” বস্তুত ইহারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বরূপ অবগত ছিলেন; অধিকন্তু স্বামীজীর ইহা অধিক জানা ছিল যে, বিশাল জগতে নব অনুপ্রেরণা জাগাইবার দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দৈনন্দিন খুঁটিনাটির মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না। অতএব সংগৃহীত সমস্ত অর্থাদি মহারাজের হস্তে অর্পণান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, “এতদিন যার জিনিস বয়ে বেড়িয়েছি, আজ তাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।” এখন হইতে আমরা মহারাজকে সঙ্খ্যাধ্যক্ষরূপেই পাইব।

যৌবনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া স্বামীজী ও মহারাজের মধ্যে যেমন

একটা সুদৃঢ় সখ্যভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তেমনি তাঁহাদের মধ্যে ছিল একটা আবালা অকৃত্রিম দিব্য প্রেমবন্ধন। রাখাল-রাজকে সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, “রাখাল, আজ হতে সব তোর, আমি কেউ নই।” কিন্তু মহারাজ তাঁহাকে গুরু ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন—যতদিন স্বামীজী স্থূলদেহে ছিলেন, একটি কাজও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া করিতেন না। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরও এই শ্রদ্ধা শতধা পরিস্ফুট হইত। তাঁহার প্রদত্ত একখানি গ্রন্থ ধরিবার পূর্বে মহারাজকে গঙ্গাজলে হস্ত প্রক্ষালন করিতে দেখা যাইত। স্বামীজীর প্রতিকৃতি হস্তে লইয়া তিনি কি প্রেমিকের দৃষ্টিতেই না উহা নিরীক্ষণ করিতেন! ইহাদের পরস্পরের প্রতি আচার-ব্যবহার যেমন বন্ধুজনসুলভ হাস্যপরিহাসপূর্ণ, তেমনি প্রেমকলহবহুলও ছিল। দুইজনে মঠপ্রাঙ্গণে একটি কাল্পনিক রেখাপাতপূর্বক স্থির করিয়া লইয়াছিলেন, কাহার প্রতিপালিতদের কতটুকু গণ্ডি। এই রেখা অতিক্রমপূর্বক একের হাঁস প্রভৃতি অপরের বাগানে আসিয়া পড়িলে তুমুল প্রেমকলহ উপস্থিত হইত এবং সারা মঠ সে আমোদে মাতিয়া উঠিত। এদিকে রোগে ভুগিয়া স্বামীজীর মেজাজ সব সময়ে ঠিক থাকিত না। তাঁহার দিন অল্প; তাই পরিকল্পনাগুলি দ্রুত কার্যে পরিণত হইতেছে না দেখিয়া ধৈর্যচ্যুতি হইত; আর সে বিরক্তির অধিকাংশই আসিয়া পড়িত মঠাধ্যক্ষ মহারাজের উপর। আবার পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝিয়া তিনি বলিতেন “রাজা, রাজা, আমায় ক্ষমা কর। আমি কি অন্যায় না করেছি, তোমায় গালাগালি করেছি—আমায় ক্ষমা কর।” আর তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, “আমাকে সবাই ত্যাগ করতে পারে; কিন্তু আমি জানি, রাজা আমাকে কখনও ছাড়বে না। আর দুনিয়ায় যদি কেউ আমার গালাগালি সহ্য করে থাকে, সে একমাত্র রাজা।” মহারাজও মনে করিতেন, “সে বকেছে তো হয়েছে কি?” আর স্বামীজীর অনুশোচনা দেখিয়া তিনি বলিতেন, “তুমি অমন করছো কেন? আমায় গালাগাল দিয়েছ তাতে হয়েছে কি? তুমি ভালবাস, তাই তো এসব বলেছ।” এই নিবিড় প্রীতির সম্বন্ধ আমরা লোকদৃষ্টিতে বুঝিব কিরূপে? মহারাজ একদিন ঠাকুরের একটি আদেশ অমান্য করিলে ঠাকুর সহাস্যে নিকটবর্তীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, রাখাল এতদিনে সত্য সত্যই তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভালবাসিয়াছেন বলিয়াই ঐরূপ আপনার জনের ন্যায় আবদার করিতে পারিয়াছেন। মহারাজ ও স্বামীজীর সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে আমরা দিগকেও ঐ অলৌকিক প্রেমের দৃষ্টিই অবলম্বন করিতে হইবে। বস্তুত শুধু নেতা ও পরিচালিতের সম্বন্ধ লইয়া রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ গঠিত হয় নাই। এ প্রেমের লীলাখেলা কিন্তু অচিরেই শেষ হইয়া গেল—স্বামীজী মহাসমাধিতে লীন হইলেন। মহারাজ সেদিন বলরাম-মন্দিরে ছিলেন—সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং প্রিয় ভ্রাতার বক্ষস্থলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে সন্তর্পণে তুলিয়া

আনিলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাষ্প-গদগদ-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, “সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল!”

স্বামীজীর অদর্শনের পর সঙ্ঘনায়কের গুরুদায়িত্ব বহন করা যে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা মহারাজ সুবিদিত ছিলেন। ইতঃপূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ভারত ও ভারতেতর দেশে সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহাদের সুনাম রক্ষা ও অধিকতর প্রসার বহু আয়াসসাধ্য—ইহা জানিয়াই মহারাজ সাবধানে অথচ সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস লইয়া কার্যে অগ্রসর হইলেন। শীঘ্রই তাঁহার অপরিসীম ভালবাসা ও আধ্যাত্মিক শক্তির আকর্ষণে দলে দলে ভক্তগণ আসিত লাগিলেন। অনেক ত্যাগী যুবকও মঠে যোগ দিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। মহারাজ এই যুবকদিগকে সমুচিত শিক্ষাদি দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণবাণী-বহনের উপযুক্ত আধার করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ঠাকুরের শিক্ষাশ্রমে তিনি মানুষ চিনিতে পারিতেন এবং অধিকারানুসারে নিষ্কাম কর্ম, শাস্ত্রাধ্যয়ন, পূজা-পাঠ, ধ্যান-জপ ইত্যাদির উপদেশ দিতেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, সহজ সরল ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সকলেই মুগ্ধ হইত—ত্যাগী বা গৃহস্থ যিনিই একবার আসিয়া পড়িতেন, তিনি আবার আসিতে বাধ্য হইতেন, এমন কি, ক্রমে তাঁহার অনুগত হইয়া যাইতেন।

শিক্ষাদান ব্যতীত তাঁহার আর একটা প্রধান কার্য ছিল, মঠ-মিশনের কেন্দ্রগুলিতে গমনপূর্বক তথায় কিছুকাল অবস্থান করা এবং সাধুদের জীবনগঠনে সাহায্যদান এবং ভক্তদিগকে আকর্ষণপূর্বক কেন্দ্রগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তাঁহার এই সকল প্রচেষ্টার ফলে একদিকে যেমন মঠ-মিশন জনসমাজে আদৃত ও উহাদের ভিত্তি দৃঢ়তর হইতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি উহাদের প্রভাব ভারতেতর দেশেও প্রসারিত হইতে থাকিল। স্বামীজী বেলুড়, মাদ্রাজ ও মায়াবতীতে মঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন এবং কাশীর অদ্বৈতাশ্রমের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন; অধিকন্তু ঢাকাতে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ হইতে একটি মঠ গড়িয়া উঠিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর আদর্শ ও উৎসাহে মিশন-বিভাগের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে সারগাছি আশ্রম, ১৯০০ অব্দে কাশী সেবাশ্রম, ১৯০১ অব্দে কনখল সেবাশ্রম এবং ১৯০২ অব্দে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়। ইহার পর মহারাজ উহাদের স্থায়িত্ব-সম্পাদন ও নূতন নূতন কেন্দ্রস্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন।

সঙ্ঘনায়করূপে তিনি হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির উন্নতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের নূতন নূতন কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে তাঁহার উদ্দীপনা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের এই সকল কেন্দ্রের যখন যেটিতে তিনি যাইতেন, সেইটিতে তখন আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইত।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ কাশীতে যাইয়া একমাস বাস করেন। স্বামীজীর জীবদ্দশাতেই কাশীতে জন কয়েক যুবক মিলিয়া ‘হোম অব্ রিলিফ—পুওর মেন্‌স্ রিলিফ এ্যাসোসিয়েশন’ (অনাথাশ্রম—দরিদ্র-দুঃখ-প্রতিকার সমিতি) নামক এক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।^১ স্বামীজী মহারাজকে বলিয়া যান, “এ প্রতিষ্ঠানটির উপর দৃষ্টি রেখো।” এবারে মহারাজের আগমনে প্রতিষ্ঠানের উৎসাহ বর্ধিত হইল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর একটি সাধারণ সভা আহ্বানপূর্বক সকলে স্থির করিলেন যে, উহা রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। এইরূপে উহাই পরে অধুনা বিখ্যাত ‘রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে’ পরিণত হয় এবং রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের পার্শ্বে সংগৃহীত নিজস্ব ভূমিতে উহার গৃহাদি নির্মিত হয়। অতঃপর মহারাজ কনখলে যান। সেখানে স্বামীজীর শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। তখন মাত্র তিনখানি চালাঘর ছিল। উহারই একখানিতে মহারাজ অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহার পরে মহারাজের মারফত কিছু কিছু অর্থের ব্যবস্থা হইলে আশ্রমের জন্য জমি সংগৃহীত হয় ও ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার নির্দেশে ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তত্ত্বাবধানে স্থায়ী গৃহ নির্মিত হয়। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে কনখল হইতে মহারাজ বৃন্দাবনে গমনপূর্বক তপস্যানিরত স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত মিলিত হন। এই সময়ে মহারাজ রাত্রি ১২টায় উঠিয়া ধ্যান করিতেন। একদিন উঠিতে দেরি হইলে এক সূক্ষ্মদেহী বাবাজী তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া উঠাইয়া জপাদি করিতে ইঙ্গিত করেন। বৃন্দাবন হইতে মহারাজ এলাহাবাদে যান এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর সহিত একদিন যাপন করিয়া বিস্ফাচলে উপনীত হন। সেখানে তাঁহার ত্রিরাত্র বাসের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু স্থানমহাত্ম্যে ও ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের অনুরোধে কয়েক সপ্তাহ থাকিয়া যান। বিস্ফাচলে তিনি যেন সর্বদাই দেবীর ভাবে বিভোর থাকিতেন। কখনও গভীর নিশীথে দেবীদর্শনে গমন, কখনও জনমানবশূন্য স্থানে ধ্যান, কখনও বা মায়ের গুণগানশ্রবণ ইত্যাদিতে দিনগুলি পরমানন্দে কাটিয়া যাইত। অনন্তর নভেম্বর মাসে তিনি বেলুড়ে প্রত্যাগমন করেন। পর বৎসর মার্চ মাসে তিনি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভান্তে স্বামী বিরজানন্দের সহিত বায়ুপরিবর্তনের জন্য শিমুলতলায় যান। মঠে ফিরিয়া আসার কয়েকমাস পরে (১৯০৪-এর শেষে) ভাগলপুরে প্লেগের আবির্ভাব হইলে তথায় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য আরম্ভ হয়।

১। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুন হইতে সেবাকার্য আরম্ভ হয়। ঐ বৎসর জুলাই মাস হইতে ক্লামেশ্বর ঘাটে একটি আশ্রম ও কিছু পরে জঙ্গমবাড়ির এক ভাড়াবাড়িতে সেবাকার্য চলিতে থাকে। ১৫ সেপ্টেম্বর সমিতির নামকরণ হয়। ১৯০১-এর প্রথমে সেবাকার্য দশাশ্বমেধ ঘাট রোডে এবং ২ জুন ৩৮।১৫৩ নম্বর রামাপুরার বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন মহারাজের পুরী গমনকালে প্রেমানন্দজীও তাঁহার সঙ্গে যান এবং স্বামী শিবানন্দ এবং অখণ্ডানন্দ রথযাত্রার পূর্বে তথায় সম্মিলিত হন। এ বৎসর ২৩ আগস্ট তারিখে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত স্বামী অভেদানন্দ নীলাচলে আসিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন; অধিকন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও দুইদিন পরে সেখানে উপস্থিত হন। অনন্তর ডিসেম্বর মাসে মহারাজ কোঠার হইয়া বেলুড়ে ফিরিলেন—সেখানে মিসেস সেভিয়ার তাঁহার সাক্ষাৎকারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনর্বার পুরীধামে গমন করেন এবং পুরী হইতে ডিসেম্বর মাসে ভদ্রকে যান। ভদ্রকে তখন বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব। ভক্তগণ তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলিলেও তিনি সেখানে অবস্থানপূর্বক সকলকে স্বাস্থ্যবিধিপালনে উৎসাহিত করিতে থাকেন এবং যথাসময়ে কোঠার হইয়া মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। অচিরেই কাশীধামে সেবাশ্রমের ভিত্তিস্থাপনের জন্য তাঁহাকে তথায় যাইতে হইল। মহারাজ সকল বিষয়েই বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেন এবং তাঁহার সৎ পরামর্শ সকলেই নতশিরে মানিয়া লইতেন। কারণ উহার সঙ্গে থাকিত তাঁহার অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা। অতএব ১৬ এপ্রিল ভিত্তিস্থাপনকার্য-সমাপনান্তে স্বামী অচলানন্দ তাঁহারই অনুমোদিত পরিকল্পনানুসারে বাটি নির্মাণকার্যে নিরত হইলেন। অতঃপর মহারাজ বেলুড়ে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পরে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে রথযাত্রার পূর্বে তিনি পুরীধামে গমন করেন এবং সেখান হইতে অক্টোবর মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত দাক্ষিণাত্যভ্রমণে নির্গত হন।

উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণভারতেও স্বামী ব্রহ্মানন্দ সর্বদা ভগবদ্ভ্যানে মগ্ন থাকিতেন। মাদ্রাজ মঠে একদিন সন্ধ্যারতির সময় দেখা গেল যে, তিনি আরতি শেষ হওয়ার আধ ঘণ্টা পরেও একই ভাবে সমাধিমগ্ন রহিয়াছেন। ঐ দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে মার্কিন ভক্তমহিলা দেবমাতা মাদ্রাজেই ছিলেন। মহারাজ সদলবলে তাঁহার বাসভবনে বড়দিনের উৎসব উদ্‌যাপন করেন। মাদ্রাজে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি রামকৃষ্ণানন্দজীর সহিত তীর্থদর্শনে নির্গত হন। সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে তিনি একশত আটটি করিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের বিশ্বপত্রে মহাদেবের পূজা করেন। মাদুরায় শ্রীশ্রীমীনাক্ষীদেবীকে দর্শন করিয়া তিনি দিব্যভাবে বিহ্বল হন, এবং তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহার দেহ স্বহস্তে ধারণ করেন। এই দর্শন সম্বন্ধে পরে মহারাজ বলিয়াছিলেন, “যখন মন্দিরে বিগ্রহের সামনে দাঁড়িলাম তখন দেখলাম, জগন্মাতার বিগ্রহ যেন জীবন্ত হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন—তাইতে সংজ্ঞাহারা হয়েছিলাম।” মাদুরা হইতে সকলে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করেন।

মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে তখন প্রবল সামাজিক পার্থক্য। ইহা জানিয়াও মহারাজ একদিন একজন অব্রাহ্মণ ভক্তের আমন্ত্রণক্রমে তাঁহার গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করিতে গেলেন। সেদিন ঐ বাটিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেকেই নিমন্ত্রিত ছিলেন। মহারাজের অনুকরণে ও অনুপ্রেরণায় তাঁহারা সকলেই পঙ্ক্তিভোজনে বসেন এবং ভক্তটির কন্যা এবং অন্যান্য মহিলারাও পরিবেশনে যোগদান করেন। মাদ্রাজ হইতে তিনি বাঙ্গালোরে যাইয়া ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি নবনির্মিত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকার্যে নেতৃত্ব করেন। সেখানে রামনাম-কীর্তন শুনিয়া তিনি খুবই মুগ্ধ হন এবং উহা লিখিয়া আনিয়া মঠ ও মিশনের সর্বত্র প্রচলিত করেন। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি পুরীধামে ফিরিয়া আসেন।

অতঃপর দেখা গেল যে, রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যের প্রসার হওয়ায় উহাকে আইন অনুসারে রেজিস্ট্রি করা আবশ্যিক। এই উদ্দেশ্যে মহারাজ দাক্ষিণাত্য গমনের পূর্বেই ১৯০৮ অব্দের প্রথমাংশে স্বামী শিবানন্দ ও অখণ্ডানন্দের সহিত বলরাম-মন্দিরে অবস্থান করিয়া আলোচনা চালাইতেছিলেন। স্বামী সারদানন্দও সেই আলোচনায় মধ্যে মধ্যে যোগ দিতেন। এইরূপে মিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যধারা স্থিরীকৃত হইয়া গেলে মহারাজের দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে মিশনকে রেজিস্ট্রি করা হইল।

মহারাজ দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যে গমন করেন ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে। ইতঃপূর্বে মাদ্রাজ মঠের নিজস্ব জমি হইয়া গিয়াছে। মহারাজ নূতন মঠ-বাটির নক্সাদি দেখিয়া দিলেন এবং ৪ আগস্ট মহাসমারোহে উহার ভিত্তিস্থাপন হইল। ইহার এক সপ্তাহ পরে তিনি বাঙ্গালোরে গেলেন। সেখানকার মঠে প্রতি রবিবার অস্পৃশ্যজাতির অনেকে আসিয়া কীর্তনাদি করিত। ইহাতে মহারাজ বড়ই প্রীত হইতেন, তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন এবং প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিতেন। এমন কি, একদিন তাহাদের পল্লিতে তাহাদের দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া সকলকে অবাক করিয়াছিলেন। বাঙ্গালোর হইতে তিনি মেলকোট, শিবসমুদ্রম্ ও মহীশূরের দেবস্থানাদি দর্শনে যান এবং পুনরায় বাঙ্গালোরে প্রত্যাবর্তনান্তে কন্যাকুমারী যাত্রা করেন। পথে মন্দিরাদি দর্শন করিতে করিতে তিনি ক্রমে ত্রিবান্দ্রমে উপনীত হইলেন। এখানে আশ্রমস্থাপনের জন্য পূর্ব হইতেই ভূমি সংগৃহীত ছিল। মহারাজ ৯ ডিসেম্বর ভিত্তিস্থাপন করিলেন। কন্যাকুমারীতে প্রায় এক সপ্তাহ অবস্থানকালে তিনি প্রতিদিন দেবীদর্শন করিতেন এবং মন্দিরে ভাবে বাহ্যহারা হইয়া অনেকক্ষণ স্থাণুবৎ বসিয়া থাকিতেন। কন্যাকুমারী হইতে বাঙ্গালোরে ফিরিয়া তিনি মাদ্রাজে

গমন করেন এবং মাদ্রাজকে কেন্দ্র করিয়া দাক্ষিণাত্যের আরও কয়েকটি তীর্থ দর্শন করেন। এই সময়মধ্যে মাদ্রাজের মঠ-বাটির কিয়দংশ সম্পূর্ণ হইলে ১৯১৭ অব্দের ২৪ এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেখানে আনা হইল এবং ৩০ এপ্রিল হইতে মহারাজ ঐ বাটিতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। অবশেষে ৬ মে মাদ্রাজের ছাত্রাবাসের ভিত্তিস্থাপন হইয়া গেলে ৯ মে তিনি পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ঐ ছাত্রাবাসে দ্বারোন্মোচন উপলক্ষে ১৯২১ অব্দের ১ এপ্রিল স্বামী শিবানন্দ ও সাধুভক্তগণের সহিত তিনি পুনর্বার মাদ্রাজ যাত্রা করেন। মে মাসের শেষে ঐ শুভকার্য সমাধান করিয়া কিছুদিন পরে তিনি বাঙ্গালোরে উপস্থিত হন এবং সেপ্টেম্বর মাসে মাদ্রাজ মঠে প্রত্যাগমনান্তে কলকাতা হইতে মৃন্ময়ী শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমা আনাইয়া যথাবিধি ৩শারদীয়া পূজা করান। অতঃপর যথাকালে শ্রীশ্রীকালীপূজারও অনুষ্ঠান করাইয়া ১৯ নভেম্বর মাদ্রাজ পরিত্যাগপূর্বক ২১ নভেম্বর ভুবনেশ্বরে পৌঁছান।

আমরা বর্ণনার সুবিধার জন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ একই স্থানে সন্নিবদ্ধ করিলেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্তর্বর্তী সময়গুলিতেও মহারাজ বিভিন্ন মঠ-মিশন-কেন্দ্র ও তীর্থাদি-দর্শনে এবং তত্তৎস্থলে উৎসাহবর্ধনে ও পুণ্যস্মৃতিস্থাপনে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯১৬ অব্দে তিনি স্বামী প্রেমানন্দ ও বহু সাধুভক্তের সহিত কামাখ্যা তীর্থদর্শনে গমন করেন। সেখানে তিনি কিরূপ দিব্যভাবে তন্ময় থাকিতেন তাহা তাঁহার সঙ্গিমাত্রই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বস্তুত গ্রন্থাদিতে যাঁহারা ভাবঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি প্রভৃতির কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা এই সকল দেবস্থানে তাঁহার মানসপুত্রের এই ভাববিহুলতা দেখিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিলেন। ৩কামাখ্যা হইতে তিনি ময়মনসিংহে যান এবং তথায় দিন কয়েক অবস্থানান্তে ঢাকায় উপস্থিত হন। সেখানে তিনি ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে রামকৃষ্ণ মিশন-বাটির ভিত্তি স্থাপন করেন। এই সময়ে তিনি একবার দেওভোগে গমনপূর্বক নাগমহাশয়ের তপস্যাপূত আশ্রম দর্শন করেন।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ, শিবানন্দ, রামলাল-দাদা এবং কয়েকজন সাধু ও ভক্তের সঙ্গে হরিদ্বারে গমন করেন। সেইবারে তাঁহার উপস্থিতিতে কনখল সেবাশ্রমে মহাসমারোহে প্রতিমায় ৩দুর্গাপূজা হয়। তীর্থস্থানে সাধুসেবার প্রয়োজনবোধে মহারাজ সকল সম্প্রদায়ের সাধুদিগকে পূজায় আমন্ত্রণ করেন এবং তাহারাও আশ্রমে পদার্পণপূর্বক পরিতোষসহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এইরূপে সাধুসমাজের সহিত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। পূজান্তে মহারাজ প্রভৃতি সকলে কাশীতে আগমন করেন।

এই সময়ে বিখ্যাত সুগায়ক অঘোরবাবু প্রায়ই মহারাজকে ভজন শুনাইতেন এবং মহারাজও ইহাতে বিশেষ আনন্দ পাইতেন। বস্তুত গুণী গায়ক ও গুণগ্রাহী শ্রোতার সমাবেশে ভগবদ্ভাবপূর্ণ সে সঙ্গীত-লহরী উপস্থিত সকলকেই মুগ্ধ করিত। তখন মাস্টার মহাশয় কাশীতে ছিলেন, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীও ছিলেন। মাস্টার মহাশয়ের ধারণা ছিল যে, ঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবের মধ্যে পার্থক্য আছে। একদিন শ্রীশ্রীমা সেবাশ্রম দেখিতে আসিয়া বলিলেন যে, উহা ঠাকুরেরই কাজ—ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন। তিনি চলিয়া গেলে রহস্যপ্রিয় মহারাজের ইঙ্গিতে অল্পবয়স্ক সাধুব্রহ্মচারীরা মাস্টার মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন, “মাস্টার মহাশয়, মা বলেছেন সেবাশ্রম ঠাকুরের কাজ, সেখানে ঠাকুর প্রত্যক্ষ রয়েছেন; এখন আপনি কি বলেন?” ঠাকুরের শরণাগত ভক্ত মাস্টার মহাশয় সহাস্যে বলিলেন, “আর অস্বীকার করবার জো নাই।”

এই ভাবে কাশীতে সেবাশ্রমে ছয় মাস যাপনান্তে মহারাজ ১৯১৩ অব্দের এপ্রিল মাসে মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন; কিন্তু ঐ বৎসর ৩দুর্গাপূজা উপলক্ষে পুনর্বার কাশীধামে উপস্থিত হইয়া সেখানেই দুর্গোৎসব সমাধা করিলেন। কাশীতে তিনি প্রত্যহ ‘কাশীখণ্ড’ শ্রবণ করিতেন এবং সকলকে সাধনভজনে উৎসাহিত করিতেন। বৃক্ষাদির প্রতি তাঁহার আশৈশব প্রীতি ছিল; দেশ-বিদেশ হইতে বৃক্ষাদি আনাইয়া তিনি সেবাশ্রমের ভূমির শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। উভয় আশ্রম যাহাতে পরিষ্কার থাকে তৎপ্রতিও তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ঐ বৎসর সেবাশ্রমের একটি বিশ্ববৃক্ষে তিনি একজন সুস্মদেহীর দর্শনলাভান্তে সকলকে ঐ বৃক্ষ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেন; তবে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ঐ বিদেহী অনিষ্টপরায়ণ নহেন। মহারাজের এইরূপ অসংখ্য অলৌকিক দর্শনের দুই-চারিটিই মাত্র লোকসমাজে প্রচারিত হইয়াছে।

অনন্তর মহারাজ ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে অযোধ্যায় গমন করেন। সেখানে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে একদিন একজন নটের সুমধুর নৃত্য ও ভজনে আত্মহারা হইয়া তিনি প্রবল বারিপাতসত্ত্বেও স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া থাকেন; অগত্যা সঙ্গীদিগকে ঐ বৃষ্টি হইতে তাঁহার রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। বারিপাত নিবৃত্ত হওয়ার বহু পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া বাসস্থানে প্রত্যাগমন করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, মহারাজ নিজে যেমন ধর্মসঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, সাধুব্রহ্মচারীদিগকেও তেমন সমবেতকণ্ঠে কালীকীর্তন, রামনামকীর্তন ও স্তোত্রাদিপাঠে উৎসাহিত করিতেন। ভজনকালে তিনি সকলের মধ্যে নীরবে এমন ভাববিভোর হইয়া বসিয়া থাকিতেন যে, তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাব সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিত এবং শ্রোতৃবৃন্দও সেই জমাট ভাবের যতটুকু সম্ভব স্বায়ত্ত করিবার অভিলাষে নিম্পন্দ হইয়া বসিয়া

থাকিতেন। তাঁহার আদেশে মন্দিরাদিতেও কীর্তন হইত। এইরূপে কাশীর ৩দুর্গাবাড়ি, সঙ্কটমোচন ও ৩অন্নপূর্ণার মন্দিরাদিতে বহুবার সাধুদের কীর্তন শুনিয়া সমাগত যাত্রিগণ আনন্দে আপ্লুত হইয়াছেন। অযোধ্যাদর্শনান্তে মহারাজ কাশীতে ফিরিলেন। ভারতের সুপ্রাচীন জনবিশ্রুত তীর্থসমূহে সানন্দে ভগবৎসন্তোগে নিমগ্ন মহারাজের তখন অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা ছিল না; তথাপি স্বামী প্রেমানন্দের নির্বন্ধাতিশয়ে ৩কালীপূজার পরে প্রয়াগদর্শনান্তে নভেম্বর মাসে বেলুড় যাইতে হইল।

মহারাজের কাশীধামে শেষ আগমন হয় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি। ঐ সময়ে কাশী সেবাশ্রমের আভ্যন্তর অবস্থা নিরীক্ষণান্তে সারদানন্দজী ভুবনেশ্বরে যাইয়া মহারাজকে জানাইলেন যে, সেবাশ্রমের সুব্যবস্থার জন্য তাঁহার সেখানে গমন আবশ্যিক। অগত্যা তিনি সারদানন্দজীর সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অদ্বৈতাশ্রমে উঠিলেন। সকলেই ভাবিয়াছিলেন সঙ্ঘাধ্যক্ষ আসিয়াই কর্মব্যস্ত হইয়া পড়িবেন, কিন্তু ফলত দেখা গেল তিনি কর্মের কোন কথা উত্থাপন না করিয়া সকলের আধ্যাত্মিক জীবন আরও গভীরতর করার মানসে বিভিন্ন উপায়-উদ্ভাবনে নিরত রহিলেন। কোনদিন উদ্দীপনাময় উপদেশ, কোনদিন কীর্তন, কোনদিন প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সমস্যাসমাধান—এই ভাবেই দিন কাটিতে লাগিল এবং এই ধারার পরাকাষ্ঠা হইল সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানে। সেই বৎসর স্বামীজী ও ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে চল্লিশ জন সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিলেন। এই অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক চিকিৎসার ফল অচিরেই পরিলক্ষিত হইল। মহারাজের প্রভাবে সেবাশ্রমের সমস্যা আপনা হইতেই মিটিয়া গেল। বস্তুত মহারাজের আচরণ ও উপদেশে কর্ম অপেক্ষা ভাগবত জীবনলাভের জন্য উদ্দীপনাই অধিক প্রকটিত হইত এবং তাঁহার সংস্পর্শে যিনিই আসিতেন তিনিই বুঝিতে পারিতেন, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ধর্মহীন সমাজসেবকদের প্রতিষ্ঠানমাত্র নহে, উহা ধর্মপিপাসুবর্গের সাধনক্ষেত্র। এইরূপে তাঁহারা মূল বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া জাগতিক অসম্পূর্ণতাকে অবহেলা করিতে শিখিতেন। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মহারাজের দৈনন্দিন ব্যবহারে তাঁহার ভাবগান্ধীর্যের পরিচয় অল্পই পাওয়া যাইত—ভাবসংবরণে তিনি এতই সক্ষম ছিলেন। কিন্তু বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে সে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভাবরাশি উথলিয়া পড়িত। অদ্বৈতাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীর্ণ প্রতিকৃতির স্থলে নূতন প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেও মহারাজ তদগতচিত্তে নিজে নাচিয়া এবং গুরুদ্রাতা স্বামী সারদানন্দ ও তুরীয়ানন্দ প্রভৃতিকে নাচাইয়া সমাগত সকলকে প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়াছিলেন।

পুরী ও ভুবনেশ্বরে মহারাজ প্রায়ই যাইতেন। পুরীতে তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করেন এবং সেখানে একটি মঠস্থাপনেরও ঐকান্তিক ইচ্ছা পোষণ করেন জানিয়া

বলরামবাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বসু মহাশয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে চক্রতীর্থে একখণ্ড ভূমি দান করেন। উহাতেই পরে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মঠ নির্মিত হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে পুরীতে অবস্থানকালে মহারাজ ভুবনেশ্বরে মঠস্থাপনের আয়োজন করেন এবং মঠনির্মাণকার্য সমাপ্ত হইলে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ৩দুর্গাপূজার সময় সাধু-ব্রহ্মচারি-সমভিব্যাহারে সানন্দে তথায় উপনীত হন। ৩১ অক্টোবর ঐ মঠের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ঐ সময় ভুবনেশ্বরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় সেখানে মিশনের সাহায্যকেন্দ্র খোলা হয় এবং স্থায়ী সুচিকিৎসার ব্যবস্থাকল্পে দাতব্য চিকিৎসালয়ও স্থাপিত হয়। ভুবনেশ্বরের আধ্যাত্মিক মহিমা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, “ভুবনেশ্বর শিবক্ষেত্র, গুপ্তকাশী বলে জানবে। এখানে একটু সাধন করলে অনেক ফল পাওয়া যায়।” মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা দীর্ঘকাল জনহিতকর কার্যে ব্যাপ্ত থাকায় অনেক ক্ষেত্রে পরিশ্রান্ত ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন। তাঁহারা ভুবনেশ্বরের মুক্ত বায়ু সেবন করিয়া এবং অনুকূল স্থানে বাস করিয়া পূর্ব স্বাস্থ্য লাভ করুন—ইহাও মহারাজের ইচ্ছা ছিল। ফলত শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনক্ষেত্ররূপেই ভুবনেশ্বরে মঠ স্থাপিত হয়। মহারাজ বলিয়াছিলেন, “ছেলেরা সব সাধনভজন করবে—আমি দেখে আনন্দ করব।” ভুবনেশ্বরে তিনি নিজে যেমন নিয়মিত ধ্যানজপাদিতে রত থাকিতেন, সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকেও ঠিক তেমনি পরিচালিত করিতেন। তাঁহার যত্নে ভুবনেশ্বরের দিনগুলি আনন্দে ও ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ থাকিত; আবার ফলফুলে, বৃক্ষলতায় সুসজ্জিত আশ্রমটি নয়ন-মনে আনন্দ ঢালিয়া দিত।

মহারাজের নিজের পক্ষে কিন্তু ঐ দিনগুলি সর্বতোভাবে সুখপ্রদ ছিল না। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে স্বামী অদ্ভুতানন্দের দেহত্যাগের পর আর এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ৪ শ্রাবণ (২১ জুলাই) রাত্রে প্রায় একটার সময় সেবক দেখিতে পাইলেন, মহারাজ একখানি চাদরে শরীর আবৃত করিয়া আরাম-কেদারায় গভীরভাবে বসিয়া আছেন। সেবক সে রাত্রে প্রশ্ন করিয়াও এই অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ জানিতে পারেন নাই। পরদিন তাহা সংবাদ আসিল, ঐ সময়ে শ্রীশ্রীমা মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। মহারাজ এই সংবাদে একান্ত মর্মান্বিত হন এবং শোকাচ্ছন্ন মাতৃহারা অবোধ শিশুর ন্যায় দ্বাদশ দিবস নগ্নপদে থাকিয়া হবিষ্যন্ন গ্রহণ করেন।

১৯২২ অব্দের প্রারম্ভে তিনি বেলুড় মঠেই অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাজ যখনই অন্য স্থান হইতে মঠে প্রত্যাবর্তন করিতেন, তখনই সেখানে উৎসব লাগিয়া যাইত। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া নানা দিক হইতে নিত্য বহু ছাত্র, রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী, সাধু, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার ভক্ত ও ধর্মপিপাসুগণ ছুটিয়া আসিতেন। মহারাজ বিবিধ অধিকারীর আধ্যাত্মিক চেতনা উদ্বোধনের জন্য কত

সময়ে কত যে অপূর্ব উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা তাঁহার সুগভীর ভাবরাজ্যের সহিত অপরিচিত নবাগন্তক সহজে বুঝিতে পারিতেন না—অথচ প্রতি সাক্ষাতের পর স্পষ্ট বোধ করিতেন, যেন তিনি এক অজ্ঞাত সম্পদের অধিকারী হইয়া গৃহে ফিরিতেছেন। মহারাজ হয়তো গল্প করিতেছেন, হাসিতেছেন কিংবা ব্যঙ্গ-কৌতুকে রত আছেন; নবাগত ইহা দেখিয়া হয়তো অবাক হইয়া ভাবিতেন, “ইনিই কি ঠাকুরের মানসপুত্র, আর ইনিই কি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্ণধার?” কিন্তু ইহারই মধ্যে জিজ্ঞাসুবিশেষ নবালোক পাইয়া ধন্য হইতেন এবং শীঘ্রই পুনর্বার আসিবার সঙ্কল্প লইয়া পরিতৃপ্ত অন্তরে গৃহে ফিরিতেন। সাংসারিক চিন্তায় নিপীড়িত কত নিরাশ মনে এই অনাবিল আনন্দ এক নবলোকের সন্ধান আনিয়া দিত! গতানুগতিক গুরুশিষ্যসম্বন্ধের সহিত পরিচিত আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষ এই অসাধারণ মহামানবের নিত্যনূতন উদ্ভাবনী শক্তির ধারণা করিবে কিরূপে?

পূর্বোক্ত বিবরণ পড়িয়া যদি কেহ স্থির করিয়া ফেলেন যে, মহারাজ সর্বদা বালকসুলভ রঙ্গরসাদিতে মগ্ন থাকিতেন, তবে নিতান্তই ভুল হইবে। তাঁহার ঐ স্বাভাবিক সরলতার সহিত এমন একটি গাভীর মিশ্রিত থাকিত যে, তাঁহার সম্মুখে সর্বপ্রকার চপলতা এককালে নিস্তব্ধ হইয়া যাইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তিনি যখন একাকী পদচারণ করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে তেজোদীপ্ত নরসিংহের ন্যায় মনে হইত এবং তাঁহার তাদৃশ মধুর প্রকৃতি জানিয়াও অকস্মাৎ কেহ সম্মুখে আসিতে পারিত না, কিংবা আসিয়া পড়িলেও বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া নীরবে তাঁহার কৃপাকটাক্ষের অপেক্ষা করিত। অধিকারী দুর্লভ; সুতরাং সুগভীর ধর্মতত্ত্বের আলোচনা কাহার সহিত হইবে? কিন্তু মানুষ ভালবাসার ভিখারি; তাই মহারাজের অধ্যাত্মভাব ঐ প্রণালী-অবলম্বনেই শিষ্যের অন্তরে সঞ্চারিত হইত। কিন্তু দৈবাৎ উচ্চতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হইলে মহারাজের সাধনালব্ধ অনুভূতির দ্বারা উদ্বেলিত এবং ভাবপ্রকাশের অপূর্ব মাধুর্যে অনুসৃত সেই আধ্যাত্মিক পীযুষধারায় দুই কূল ভাসিয়া যাইত; শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত তখনকার মতো সমস্ত বিস্মৃত হইয়া সেই অপূর্ব প্লাবনে নিমগ্ন হইত।

মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীর দেহমনের স্বাস্থ্যের প্রতিও তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে মঠে ফিরিয়া তিনি কার্যপরিচালনে নিযুক্ত স্বামী প্রেমানন্দকে বলিলেন, “ছেলেদের ধ্যান-তপস্য, সাধন-ভজন কোথায়? আর এদের স্বাস্থ্যও তো ভাল দেখছি না।” অতঃপর তিনি একদিকে যেমন স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করিলেন, অপরদিকে তেমনি নিয়ম করিলেন যে, রাত্রি চারিটায় শয্যাভ্যাগান্তে সকলে অর্ধঘণ্টার মধ্যে তাঁহার নিকটে জপধ্যানে বসিবেন এবং পরে সেখানে ভজন

ও স্তবপাঠাদি হইবে। জপধ্যানান্তে আবার সমবেত সাধুব্রহ্মচারীদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গও হইত। এদিকে মঠের কার্যের যাহাতে ক্ষতি না হয় তৎপ্রতিও তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। একদিন কার্যের কথা ভুলিয়া সকলে উপদেশশ্রবণে মগ্ন আছেন, এমন সময়ে প্রেমানন্দজীকে উঁকি মারিতে দেখিয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবুরাম-দা, কি খবর?” তিনি যুক্তকরে বলিলেন, “মহারাজ, ঠাকুরসেবা আছে যে।” মহারাজ তৎক্ষণাৎ ত্রস্তভাবে সকলকে বিদায় দিলেন। কর্ম-সম্বন্ধে কেহ বিরক্তি প্রকাশ করিলে তিনি বলিতেন, “ভগবান-লাভের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য, তোমরা বাড়ি-ঘর সব ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরের কাছে মনপ্রাণ সব সমর্পণ করেছ, তবু কর্মে বিরক্তি প্রকাশ কর?” অথবা বলিতেন, “কর্ম না করে জ্ঞানলাভ হয় না। যারা কর্ম ছেড়ে শুধু ধ্যান-জপ, সাধন-ভজন নিয়ে থাকে, তাদেরও ঝুপড়ি বাঁধতে আর ভিক্ষে করতেই সময় কেটে যায়।” আরও বলিতেন, “ঠাকুর-স্বামীজীর কর্মে কোন বন্ধন আসে না।” কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতেন, “কর্মই জীবনের উদ্দেশ্য নয়—জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।” “বার আনা মন ভগবানের দিকে রেখে চার আনায় জগতের কাজ করলে ভেসে যায়।” তাঁহার মতে সমাজসেবকদের জীবনেও ধর্মভাব থাকা একান্ত আবশ্যিক; তাই তিনি বলিয়াছিলেন, “অনেকে বলে, দেশের ও দশের কাজ করবে। আমার মনে হয়, এই ভাব ইংরেজি শিক্ষার বদহজম। নিজের চরিত্র তৈরি না হলে তার দ্বারা অপরের কল্যাণ কখনও সম্ভব হয় না। যারা তাঁকে ঠিক ঠিক আশ্রয় করেছে, তাঁর কৃপালাভ করেছে, তাদের কখনও বেচাল হয় না—তাদের কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, চাল-চলন দেশের মঙ্গলের কারণ হয়।” পাঠকের মন ইহাতে সায় দিয়া সহজেই বলিবে, “ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্রেরই উপযুক্ত উপদেশ।”

মঠ-মিশনের গুরুদায়িত্ব তাঁহার স্বন্ধে অপিত থাকায় উহার অভাব-অনটনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁহার যথেষ্টই ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেমন ত্যাগের আদর্শকে অতি উচ্চে তুলিয়া ধরিতেন, সঙ্ঘের জীবনেও তেমনি তাঁহার দৃষ্টিতে ত্যাগের আসন ছিল অতি উর্ধ্ব। একবার পুত্রশোকে কাতর জনৈক ধনী ব্যবসায়ী কিছুদিন বেলুড় মঠের পার্শ্বে বাস করিয়া উহার ভাবধারায় মুগ্ধ হন এবং প্রস্তাব করেন যে, তাঁহার সমস্ত ব্যবসায়টি লোককল্যাণার্থে সাধুদের হস্তে তুলিয়া দিবেন। এই সংবাদটি স্বামী প্রেমানন্দ যেমনি মহারাজকে শুনাইলেন, অমনি তিনি সম্ভ্রান্তভাবে করজোড়ে বলিলেন, “বাবুরাম-দা, সাধুসঙ্গ করে লোকটির মনে বৈরাগ্যের উদয় হল, আর তার সঙ্গ করে আমাদের বিষয়বুদ্ধি হবে?” বলা বাহুল্য, ঐ প্রস্তাব তখনই প্রত্যাখ্যাত হইল।

স্বভাবতই শান্ত ও গম্ভীর মহারাজের অন্তরের ভাবরাশি যে অকস্মাৎ কিরূপে স্বীয় ভাস্বর সৌন্দর্য বিকাশপূর্বক সকলকে বিহ্বল করিত, তাহার দুই-একটি দৃষ্টান্ত পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। বেলুড় মঠে সংঘটিত ঐরূপ আর একটি উদাহরণ দিলে পাঠক উহা আরও সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সেদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে মঠপ্রাঙ্গণে আন্দুলের কালীকীর্তন চলিতেছিল। শ্রীশ্রীমাও মঠে আসিয়াছেন। চারিদিকে একটা অতি গম্ভীর পরিবেশ। ইহারই মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া মহারাজকে কীর্তনস্থলে লইয়া গেলেন। মহারাজ তথায় উপস্থিত হইয়াই অনুপম নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ক্রমে বোধ হইল যেন তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা লোপ পাইয়াছে—দেহমাত্র তালে তালে অপূর্ব ভঙ্গিমায় দুলিতেছে। অমনি স্বামী সারদানন্দের ইঙ্গিতে তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে আনা হইল। ভিতরে আসিয়াও সে ভাবসমাধি দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিল। অবশেষে শ্রীশ্রীমা আসিয়া সন্নেহে আহ্বানপূর্বক তাঁহাকে সাধারণ ভূমিতে নামাইয়া আনিলেন।

সঙ্ঘের নেতা হিসাবে তিনি উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না—উপদেশ পালিত হইতেছে কিনা, ইহাও দেখিতেন। বাঙ্গালোর আশ্রমে অবস্থানকালে তিনি রাত্রে উঠিয়া প্রতিগৃহে যাইয়া সন্ধান লইতেন, সাধু-ব্রহ্মচারীরা সাধন-ভজন করিতেছেন কিনা। তাঁহার মতে রাত্রিকাল মনঃসমাধানের পক্ষে অতি অনুকূল; আর তিনি স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, ঠাকুরই হইবেন সমস্ত প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল। মাদ্রাজ মঠে একদা জনৈক ভক্তের আনীত ফুলগুলি সেবক তাঁহার গৃহে সাজাইতেছে দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, “কিছু ফুল ঠাকুরের জন্য রেখেছিস তো?” সেবক জানাইলেন যে, রাখা হয় নাই; আর মনে মনে ভাবিলেন, “ঠাকুরঘরে তো শুধু পটে পূজা হয়, শ্রীগুরুর মধ্যে জীবন্ত ভগবান আছেন।” মহারাজ মনের কথা ধরিতে পারিতেন; তাই ঐ ভাবেই প্রশ্ন করিয়া সব জানিয়া লইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, আশ্রমাধ্যক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতে দেন না। কাজেই অধ্যক্ষকে ডাকিয়া ঐরূপ সুযোগ দিতে বলিলেন, আর সেবককে উপদেশ দিলেন, “মনকে একাগ্র করতে হলে এমন মূর্তি আর কোথায় পাবি?” সেবক ইহার পর পূজা করিয়া সত্যই আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। সেবকদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ শুধু শাসন ও উপদেশপ্রদানেই সীমাবদ্ধ ছিল না—উহার মধ্যে একটা প্রাণের স্পর্শও ছিল। একবার জনৈক সেবকের বিরুদ্ধে অপর সেবকগণ অভিযোগ জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, “দেখ, আমার চেয়ে অনেক বড় বড় সাধু আছেন; তোমাদের ইচ্ছা হয় তাঁদের কাছে যেতে পার—আমায় সকলকে নিয়ে থাকতে হবে।”

অপরের মধ্যে হৃদয়ের বিকাশ দেখিলে তিনি খুব সন্তুষ্ট হইতেন এবং

মহাপুরুষদের জীবনে জীবের প্রতি করুণার কাহিনী তাঁহাকে অভিভূত করিত; এমন কি, স্থলবিশেষ তিনি তাঁহাদিগকে অনুসরণ পর্যন্ত করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দীক্ষার্থীদের নির্বাচনে তিনি অতি সাবধান ও বিচারপরায়ণ হইলেও ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে রামানুজাভিনয় দেখিতে যাইয়া উক্ত আচার্যের আচণ্ডালে মন্ত্রবিতরণে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অতঃপর তাঁহাকে ঐ বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা অধিক মুক্তহস্ত দেখা যাইত।

মহারাজের মনের আর একটা দিক সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। সর্বদা অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণশীল এই মনকে দৈনন্দিন কার্যের জন্য কোন আলোচনা সভায় নামাইয়া আনা বড় সহজ ছিল না। ঐরূপ সময়ে তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, তিনি সভায় যাইবেন না; কারণ শরীর ভাল নহে। অথচ একবার যদি অনুনয়-বিনয় সহায়ে তাঁহাকে আলোচনা স্থলে উপস্থিত করা হইত, তবে মঠ-মিশনের সর্ব বিষয়ে তাঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান ও তত্ত্ব বিষয়ে অনিন্দনীয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া সকলে চমৎকৃত হইতেন এবং বিনা দ্বিধায় উহা মানিয়া লইতেন। সভার বাহিরেও এই আত্মনিমগ্ন মহাপুরুষের ইঙ্গিতে বা আদেশে মঠের সমস্ত বিভাগ সুচারুরূপে পরিচালিত হইত, মঠের প্রত্যেক সাধু-ব্রহ্মচারীর চিত্ত উচ্চভাবে পরিপূর্ণ থাকিত এবং মঠভূমি দুর্লভ ফল-পুষ্পের বৃক্ষে সুসজ্জিত হইত।

স্বামীজীর সহিত তাঁহার প্রেমসম্বন্ধের পরিচয় পাঠক পূর্বেই পাইয়াছেন। এখন অপরের সহিত এই সপ্রেম ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। স্বামী অখণ্ডানন্দ একবার মহারাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সারগাছি গমনোদ্দেশে রাত্রে রেলস্টেশনে যাইতে উদ্যত হইলে মহারাজ গোপনে পালকি বাহকদিগকে কি যেন বলিয়া দিলেন। ফলে তাহারা অনেকক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরিয়া ট্রেনের সময় অতীত হইয়া গেলে অখণ্ডানন্দকে পূর্বস্থানে উপস্থিত করিল। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে; অখণ্ডানন্দজী চক্ষু মেলিয়া অবস্থা বুঝিলেন, আর অমনি মহারাজপ্রমুখ সকলে সেই আমোদে যোগ দেওয়ায় চারিদিকে হাস্যধ্বনি উথিত হইল। হাস্যপরিহাস ছাড়াও এই বন্ধুপ্রীতির প্রকাশ অন্যভাবে হইত। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে স্বামী তুরীয়ানন্দের বহুমূত্ররোগের বৃদ্ধি হইলে মহারাজ সেবকরূপে একজন ব্রহ্মচারীকে দেবাদুনে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন এবং চিঠিতে লিখিয়া দেন যে, একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া যেন স্বতন্ত্রভাবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়—মহারাজ সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন। বেলেড় মঠের সম্মুখের পোস্তা ও ঘাট-নির্মাণকালে অনুমানাপেক্ষা অত্যধিক ব্যয় হওয়ায় কার্যনিরত স্বামী বিজ্ঞানানন্দ যখন স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে পর্যন্ত যাইতে সাহস পাইতেছিলেন না, তখন মহারাজ ঐ সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্বন্ধে তুলিয়া লইলেন

এবং অগ্নানবদনে স্বামীজীর সমস্ত ভৎসনা সহ্য করিলেন যেন অপরাধ তাঁহারই। স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় রত হইলে তিনি উৎসাহ দিয়া লিখিয়াছিলেন, “তোমাকে কি বলিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। তুমি এখানে আসিলে grand reception (জমকালো অভ্যর্থনা), এবং আমরা কোলে করিয়া নাচিব।”

মহারাজ অপরের মনকে কত সহজে উচ্চসুরে বাঁধিয়া দিতে পারিতেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত মহাকবি ও ভক্তশ্রেষ্ঠ গিরিশবাবুর জীবনে পাওয়া যায়। তখন তিনি দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়া বোধ করিতেছেন, তাঁহার ভক্তি যেন শুকাইয়া গিয়াছে, এবং তিনি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিতে যেসব সাধু আসিতেন, তাঁহাদের সকলকেই তিনি ইহা বলিলেও সে যন্ত্রণা একই ভাবে চলিতে থাকে। অবশেষে মহারাজকে ঐ বিষয়ে বলিলে তিনি উচ্চহাস্যসহকারে কহিলেন, “ঐ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? সমুদ্রের ঢেউ উঠে-নামে—মনের স্বভাবও তাই। কাজেই ঘাবড়াবার কিছুই নেই। আপনার এখন যে এরূপ হচ্ছে, তার মানে, আপনি শিগ্গিরই খুব উপরে উঠবেন; মনের ঢেউ একটু শক্তি অর্জন করে নিচ্ছে মাত্র।” মহারাজ চলিয়া গেলে গিরিশবাবুর বোধ হইল যেন, তাঁহার প্রাণের শুষ্কতা কাটিয়া গিয়াছে, বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে এবং মন উচ্চতর ভূমিতে উন্নীত হইয়াছে।

তাঁহার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও শিষ্যরক্ষার দৃষ্টান্তও সমভাবে চমকপ্রদ। একদিন তিনি স্বামী প্রভবানন্দ ও অপর একজন শিষ্যের সহিত বেড়াইতেছেন, এমন সময় রব উঠিল, “পালাও পালাও”, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, একটি ষাঁড় মাথা নিচু করিয়া ঐদিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তখনই শিষ্যদ্বয় মহারাজের রক্ষার জন্য সম্মুখে যাইতে চাহিলেন; কিন্তু তিনি দৃঢ়হস্তে উভয়কে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিয়া শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ষাঁড় সেখানে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল এবং মাথা নাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। আর একবার তিনি স্বামী অখিলানন্দ ও একজন ভক্তের সহিত ভুবনেশ্বরের জঙ্গলে বেড়াইতেছিলেন। অকস্মাৎ একটি বাঘ তাঁহাদের সম্মুখে প্রায় একশত ফুটের মধ্যে আসিয়া পড়িলে মহারাজ অচঞ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বাঘও থামিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া পলাইয়া গেল।

যাহা হউক, মহারাজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিবার উপযুক্ত এই জাতীয় দৃষ্টান্তের অভাব না থাকিলেও আমাদের কাছে বাধ্য হইয়াই সে প্রলোভন ত্যাগ করিয়া জীবনেতিহাসের ধারায় ফিরিতে হইবে।

মহারাজ মধ্যে মধ্যে বেলুড় হইতে বলরাম-মন্দিরে যাইয়া বাস করিতেন। একদিন প্রাতঃকালে রামলাল-দাদা তাঁহার সাক্ষাৎমানসে সেখানে আসিলেন। দাদাকে

দেখিলেই মহারাজ আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন এবং আলাপ-আলোচনা ও হাস্যকৌতুকে মুখর হইয়া উঠিতেন। সেইদিন রামলাল-দাদাকে বলিলেন, “দাদা, আজ সন্ধ্যার পর ঢপওয়ালী সেজো—ঠাকুরের সময়কার গান সকলকে শুনাতে হবে।” বেলুড় মঠে ঐরূপ অনাবিল রঙ্গরসে দাদা সম্মত থাকিলেও পরের বাড়িতে উহা চলে কিরূপে? দাদা আপত্তি জানাইলেন; কিন্তু মহারাজের আগ্রহাতিশয়ে তাঁহাকে যথাসময়ে সন্ধ্যায় অপূর্বসাজে সজ্জিত হইয়া বলরাম-মন্দিরের দ্বিতলের হলে মহারাজ প্রভৃতির সম্মুখে আসরে নামিতে হইল। তিনি হাত নাড়িয়া নাচিতে নাচিতে ঢপ-কীর্তনের সুরে গান ধরিলেন—

“একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মতো—

(ও তোর) মন মানে তো থাকবি সেথা, নইলে আসবি দ্রুত।

আগে ছিল একহেটো জল,

এখন যমুনা অতল—সাঁতার দিতে হবে;

নৈলে যমুনার তীরে বসে ব্রজ নিরখিবে।

যদি বল ব্রজে যেতে চরণেতে ধুলা লাগিবে—

(বললে বলতেও পার, আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ)

—না হয় ব্রজনারীর নয়ননীরে চরণ পাখালিবে ॥”

গান ও গানের আখর শুনিতে শুনিতে মহারাজের সহাস্য বদন সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। গানের প্রতি চরণ কোন্ অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিতে লাগিল, প্রতি ছন্দে কোন্ অপূর্ব লীলার আকর্ষণ অনুভূত হইতে লাগিল, প্রতি ভাবে কোন্ বিরহ সমস্ত আমোদ-প্রমোদের উপর ঘনঘবনিকা টানিয়া দিতে লাগিল? ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “রাখাল যখন তার নিজের স্বরূপ জানতে পারবে, তখন তার আর দেহ থাকবে না।” আজ এই অপূর্ব সঙ্গীত কি সেই স্বরূপের পরিচয় লইয়া অবতীর্ণ হইল? তরল হাস্যকৌতুক এতটা গাভীর্যে পরিণত হইবে—ইহা কে ভাবিয়াছিল?

ইহার কয়েকদিন পরে শিবরাত্রিব্রত-উদ্‌যাপনান্তে মহারাজ বেলুড়ে আসিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা ও সাধারণ উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। অতঃপর তাঁহার পুনঃ বলরাম-মন্দিরে যাত্রার দিন প্রাতঃকালে সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে ডাকিয়া তিনি স্বামীজীর পরিকল্পিত মন্দিরের স্থান নির্দেশপূর্বক বলিলেন, “স্বামীজীর সঙ্কল্প ছিল, এখানে ঠাকুরের শ্রীমন্দির নির্মিত হয়।” অনন্তর স্বামীজীর নির্দেশানুসারে অঙ্কিত মন্দিরের নক্সাটি আনাইয়া অভিনিবেশ-সহকারে দেখিলেন—যেন সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, এই মহৎ কার্যটি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, ইহা স্বামীজী দায়স্বরূপ সঙ্ঘের উপর অর্পণ করিয়াছেন।

বলরাম-মন্দিরে আগমনান্তে দিনকয়েক স্বাভাবিকভাবেই অতিবাহিত হইল; কিন্তু ২৪ মার্চ (১৯২২ খ্রিস্টাব্দে) তিনি অকস্মাৎ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন। সকলের পরামর্শানুযায়ী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলিতে লাগিল এবং তিনি ক্রমে আরোগ্যলাভপূর্বক অল্পপথ্য করিলেন। এই রোগযন্ত্রণার মধ্যেও সদানন্দ জীবন্মুক্ত মহারাজের হাস্যকৌতুক সমভাবেই চলিত এবং দুশ্চিন্তার মধ্যেও ভক্ত ও সেবকদের হৃদয়ে আনন্দ আনিয়া দিত। তাঁহাকে একদিন বলরাম-মন্দিরের ক্ষুদ্র কক্ষ হইতে হল-গৃহে লইয়া যাইবার কালে তিনি সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, “ওরে, মরা হাতি লাখ টাকা!” মহারাজ এমনই কৌতুক-সহকারে স্বীয় রোগজীর্ণ স্থূল দেহের প্রতি সেবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন যে, এই দুঃসময়েও সেবকগণ হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না। ফলত রোগের উপশম ও এই রকম সকৌতুক ব্যবহারে সকলের হৃদয় ক্রমে আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু উহা বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো গভীর তিমিরাচ্ছন্ন নিদারুণ বাস্তবতাকে ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টিবহির্ভূত করিলেও পরক্ষণেই তাঁহারা সচকিতে দেখিলেন, তাঁহারা প্রতিকারহীন ও চিত্তবিভ্রমকারী এক ভয়ানক সঙ্কটের সম্মুখীন। অল্পপথ্য করিবার দুই দিন পরেই মহারাজের বহুমূত্রের লক্ষণ দেখা দিল। তজ্জন্য প্রথমে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। উহা ফলপ্রদ না হওয়ায় কবিরাজী চিকিৎসার প্রস্তাব হইল। ইহা শুনিয়া মহারাজ রহস্য করিয়া বলিলেন, “হাকিমিটা আর বাকি থাকে কেন?” নির্বিকার নিত্যসিদ্ধ পুরুষ তখন স্বদেহকে একটা পৃথক জড়বস্তুরূপে দেখিয়া রোগের চিকিৎসা ও উহার ফলাফল সম্বন্ধে এমনি সম্পূর্ণ উদাসীন! যাহা হউক, কবিরাজ শ্যামাদাসবাবু আসিলেন। সদানন্দ মহারাজ তাঁহার বিভূতিমণ্ডিত কপাল দর্শনে বলিয়া উঠিলেন, “মহাশয়, কপালে যাঁর চিহ্ন ধারণ করেছেন, সেই শিবই সত্য আর সবই মিথ্যা।” কোন্ অর্থে এই মিথ্যা শব্দের প্রয়োগ হইয়াছিল তাহা মহারাজই জানেন। ভক্তেরা দেখিলেন, তাঁহাদের এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইল।

ক্রমে ২৫ চৈত্র (৮ এপ্রিল) শনিবার আসিল। সেই দিন রাত্রি নয়টার সময় সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তদিগকে নিকটে ডাকিয়া মহারাজ একে একে সকলকে সম্মুখে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, “ভয় পেও না; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।” আর উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকল সন্তানের কথা চিন্তা করিয়া তাহাদের কল্যাণকামনায় বলিলেন, “বাবারা, যে যেখানে আছ, তোমাদের সকলের কল্যাণ হোক।” সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন—ধ্যান-নিমগ্ন মহাপুরুষ যেন ক্রমশ অতীন্দ্রিয় রাজ্যের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ সেই নিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তাঁহার সাগ্রহ সম্মিত বাণী উঠিল, “এই যে পূর্ণচন্দ্র! রামকৃষ্ণ! রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটি চাই। আমি ব্রজের রাখাল; দে দে আমায়

ঘুংগুর পরিয়ে দে—আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচব—ঝুম্-ঝুম্, ঝুম্-ঝুম্! কৃষ্ণ এসেছ? কৃষ্ণ কৃষ্ণ! তোরা দেখতে পাচ্ছিস নে? তোদের চোখ নেই। আহা-হা, কি সুন্দর আমার কৃষ্ণ—কমলে কৃষ্ণ, ব্রজের কৃষ্ণ—এ কষ্টের কৃষ্ণ নয়। এবার খেলা শেষ হল। দেখ দেখ, একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে আর বলছে, আয় চলে আয়।” মহারাজ নীরব হইলেন। এই ভাবে রবিবারও কাটিয়া গেল। পূর্ণদিন ১০ এপ্রিল, ২৭ চৈত্র, সোমবার রাত্রি পৌনে নয়টায় শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাখাল নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। মঙ্গলবারে সেই পূত দেহ বেলুড় মঠে আনীত ও পুষ্প-চন্দন-ধূপ-অঙ্কুর প্রভৃতির সহিত পবিত্র হোমাগ্নিতে আহুত হইল।